লেন্-গাঙ

তেন্-গাঙ

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস সংকলন-২০০৫

পণ্ডিত ও কবি স্বর্গীয় পমলাধন তন্‌চংগ্যা, স্বর্গীয় যোগেশ চন্দ্র তন্‌চংগ্যা, চিকিৎসক স্বর্গীয় নংপ বৈদ্য তন্‌চংগ্যা, রাজ গিংগুলী, কানা গিংগুলী, কবি ও সাহিত্যিক স্বর্গীয় ডাঃ কার্তিক চন্দ্র তন্‌চংগ্যা, প্রয়াত ভান্তে স্বর্গীয় আছারানন্দ মহাথের ও প্রয়াত ভান্তে স্বর্গীয় ক্ষেমাঙ্কর মহাস্থবির—যাদের অবদান তন্‌চংগ্যা জাতির কাছে চিরস্মরণীয়; তাদের পূণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই প্রকাশনাটি উৎসর্গ করা হল।

তৈন্‌-গাঙ

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস সংকলন-২০০৫

সম্পাদক

জ্যোতি বিকাশ তন্‌চংগ্যা

সম্পাদনা পরিষদ

কিশোর কুমার তন্‌চংগ্যা

পদ্ম তন্‌চংগ্যা

রুমি তন্‌চংগ্যা

পাপড়ি তন্‌চংগ্যা

অচ্ছ্য কুমার তন্‌চংগ্যা সজিব

সার্বিক সহযোগিতায়

মৃণাল কান্তি তন্‌চংগ্যা

প্রচ্ছদ

অয়ন মজুমদার

কম্পোজ ও মুদ্রণ

প্রত্যয় ক্রিয়েশন

৩৬১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাটাবন, ঢাকা

ফোন: ০১৫২ ৩৮৯১৬০, ০১৮৯ ৪৯৩১৬০

প্রকাশকাল

৯ আগষ্ট ২০০৫

মূল্য : বিশ টাকা

শুভেচ্ছা মূল্য :....................

যোগাযোগ:

৪৭৫ জগন্নাথ হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোবাইল : ০১৭৭ ৩৭৪২৪৩

Contact :

475 Jagannath Hall

Dhaka University

E-mail: toin_gang@yahoo.com

সম্পাদকীয়

'তৈন-গাঙ' একটি সাধারণ শব্দ। আদতে দেখলে এতে কোন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তন্‌চংগ্যা জাতির ইতিহাসে তৈন-গাঙ নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইতিহাস বলে তৈন-গাঙের তীরে তন্‌চংগ্যারা প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল। কালক্রমে এখান থেকেই তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর মধ্যে তন্‌চংগ্যা জাতি একটি। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে তন্‌চংগ্যাদের জনসংখ্যা ২১০৫৭ জন। অবশ্য বেসরকারী হিসেবে এর সংখ্যা আরো বেশি। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তন্‌চংগ্যা জাতি নিজ স্বকীয়তায় বিকশিত হচ্ছে। বলা চলে তন্‌চংগ্যা জাতির মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। এ জাগরণ আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার। কয়েক বছর পূর্বে যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন তন্‌চংগ্যা ছাত্র আসতে পারত না, আজ এখানে তন্‌চংগ্যা ছাত্রদের পদচারণা লক্ষনীয়।

কোন জাতির প্রধান সম্পদ হচ্ছে তার সংস্কৃতি। বিশ্বের বহুদেশে বহু জাতি তাদের সংস্কৃতি নানা কারণে হারাচ্ছে। তন্‌চংগ্যা জাতিও এর ব্যতিক্রম নয়। আর এই দৈন্যদশা থেকে রক্ষাকল্পে "তৈন-গাঙ" যদি জাতিকে তার সংস্কৃতি রক্ষায় উদ্ধুদ্ধ করতে পারে তবেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হবে। ভুল থাকা অবান্তর কিছু নয়। ভুলগুলো পাঠক সমাজ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এই আশা করছি।

একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হবার অন্তরালে থাকে কিছু লোকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও সহযোগিতা । যেসব সুধীজন লেখা পাঠিয়ে, বিজ্ঞাপন ও পরামর্শ দিয়ে আমাদের প্রকাশনাকে ঋদ্ধ করেছেন তাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে কামনা করি আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০০৫ সফল হোক।

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

জীবনী

কবিতা

প্রসঙ্গ : তৈন্-গাঙ

শ্রী বীর কুমার তনুচংগ্যা

তৈন্-গাঙ নামটি খুবই সুন্দর। সবুজ শ্যামল প্রকৃতির মাঝখানে এঁকে বেঁকে বয়ে যাওয়া তৈন্-গাঙ আরো মনোরম। ইহা বান্দরবান পার্বত্য জেলার সর্ব দক্ষিণে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পূর্ব থেকে পশ্চিমমুখী প্রবাহিত হওয়া মাতামুহুরী নদীর একটি বিখ্যাত উপনদী। তৈন্-গাঙ এর সাথে তনচংগ্যাদের একটি সম্পর্ক আছে। কথিত আছে দৈংনাকদের চার হাজার লোকের একটি দল আরাকান ত্যাগ করে প্রথমে এই তৈন্ছড়ি অববাহিকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে নাকি বারজন আঙু বা দলপতি ছিল। ক্রমে ক্রমে তাদের অধিকাংশই মাতামুহুরী নদীর অববাহিকা বরাবর পশ্চিম দিকে সরে আসে। লামা এবং মানিকপুর এসে কিছু অংশ দক্ষিণে যায়। বর্তমানে নাক্ষ্যংছড়ি এবং কক্সবাজার জেলার উখিয়া টেকনাফ গিয়ে স্থিত হয়। বর্তমানেও আছে। অপর এক অংশ উত্তর-পূর্ব দিকে শঙ্খনদীর অববাহিকায় প্রবেশ করে এবং মূল বা বৃহদাংশ পশ্চিম দিকে গিয়ে, সমুদ্র পাড়ে ধ্যাংপাহাড় পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম বসতি শুরু করে। তারা সবাই মিলে পর্তুগীজদের থেকে একটি দালান ক্রয় করে তৎকালীন চাকমা রাজা ধরম্ বক্স্ খাঁকে উপহার প্রদান করে। সেই মূল অংশ দৈংনাকেরা চট্টগ্রাম থেকে বড়গাঙ (কর্ণফুলি নদী) অববাহিকার বরাবর পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, শিলক এইসব এলাকায় এসে চাকমাদের সঙ্গে বাস করতে শুরু করে। স্থানীয় লোকদের কাছে জানা যায় রাউজান থানার বাগোয়ান গ্রামে তারা একটি সুন্দর ক্যাঙ নির্মাণ করে এবং একটি সুন্দর বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। ফরাচিং ক্যাঙ নামে বাগোয়নের সেই ক্যাঙ সমগ্র বড়ুয়া বৌদ্ধ মহলে সুপরিচিত। সেই মূল অংশের লোকেরা বর্তমানে রমতিয়া, রাজস্থলী, জয়াগঙ্গা, রইশ্যাবিলি, রাইংখ্যং অববাহিকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং রাঙ্গামাটি শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থিত হয়েছে। বর্তমানে তারা যে সকল অঞ্চলে বসবাস করছে তখন সেই সব অঞ্চল ছিল চাকমারাজ্য। তারা যে ভাষায় কথা বলে এবং যে লিপি বা বর্ণমালা নিয়ে তাদের তান্ত্রিকশাস্ত্র, পালাগান এবং চিঠিপত্র রচিত হয় সেই লিপি বা বর্ণমালার সঙ্গে চাকমাদের ভাষা লিপি বা বর্ণমালা ঠিক একই রকম। মহিলাদের পোশাক পরিচ্ছদে যৎসামান্য ভিন্নতা দেখা গেলেও ডিজাইন, স্টাইল প্রভৃতি মিলিয়ে দেখলে মূলত একই।

চাকমা রাজার অফিসে তাদেরকে মাগহে তৈন্‌গাংঙ্যা চাকমা নামে তৌজিভুক্ত করা হয়েছিল। এই তৈন্‌গাংঙ্যা চাকমা নামটি লোকমুখে তৈন্‌টংঙ্যা, তৈন্‌চাংমা বলে উচ্চারিত হতে থাকে। বৃটিশ সরকারের অফিসে ইহা "তঞ্চঙ্গ্যা"এ বানানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমানে সরকারের সকল নথিপত্রে "তঞ্চঙ্গ্যা" শব্দটি তাদের পদবির বেলায় ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ইহাই (তঞ্চঙ্গ্যা) শুদ্ধ বা স্বীকৃত বলে গৃহীত হয়েছে।

এইভাবে তৈন্‌-গাঙ তঞ্চঙ্গ্যাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। এখন সবার সামনে একটি প্রশ্ন—চাকমা রাজার অফিসে আরাকানত্যাগী দৈংনাকদের তৈন্‌গাঙ চাকমা নামে তৌদ্ধিতে অর্ন্তভুক্ত করা হল কেন। তাদেরকে দৈংনাক নামে কি অন্তর্ভুক্ত করা যেতনা? এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে একমাত্র ইতিহাসেই। ইতিহাসের সূত্র ধরেই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। আরাকান ত্যাগ করে আসা দেংনাকদের তৈন্‌গাঙ চাকমা নামে তৌজিতে অন্তর্ভুক্ত করা সময় চাকমা রাজার অফিসে তাদের (দৈংনাকদের) ইতিহাস পর্যালোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। তা মনে করতে হবে। কেননা সরকারী নথিপত্রে খেয়াল খুশিমত কোনো কিছু নথিভুক্ত করা কোন রাজা বা কর্তৃপক্ষেরই উচিৎ নয়। "তৈন্‌গাঙ" শব্দটির মাধ্যমে আমরা কি নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে চাই? নিজের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করা যে কোনো মানুষের কর্তব্য।
আমি মনে করি আমাদের তরুণ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ নিজেদের অস্তিত্বের সন্ধানে এখন উদ্‌গ্রীব। তারা সর্বতোভাবে আত্মানুসন্ধানের উদ্যোগ নিয়েছেন আমি তাদের এই শুভ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। প্রথমে যে কথাটি ব্যক্ত করেছি— দৈংনাকদের চার হাজার লোকের একটি দল আরাকান ত্যাগ করে প্রথমে তৈন্‌গাঙ অববাহিকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল—ইহা চাকমা জাতির ইতিহাসের এক পর্যায় এবং ইহা সত্য। কাজেই বর্তমান তনচংগ্যারা সেই আরাকান ত্যাগী দৈংনাকদের উত্তর পুরুষ। তাহলে দৈংনাকদের উৎপত্তি এবং ঠিকানা সম্পর্কিত ইতিহাস পর্যালোচনা-গবেষণা করলেই আমাদের অস্তিত্বের সন্ধান সহজ হবে। কারণ আমাদের অস্তিত্ব সেখানেই আত্মগোপন করে আছে।

লেখক ও সংস্কৃতি কর্মী

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস
আদিবাসীদের ভালোবাসেন এমন বিশাল হৃদয়ের মানুষ খুঁজি?
সঞ্জীব দ্রং

গত বছর এ আদিবাসী দিবসে প্রথম আলোতে আমি লিখেছিলাম, আজ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। বিশ্বের দেশে দেশে আদিবাসীদের স্বপ্ন দেখার দিন, নতুন করে মানুষের মতো করে বাঁচার স্বপ্ন, নিজেদের স্বতন্ত্রতা নিয়ে, সংস্কৃতি নিয়ে, মূল্যবোধ ও চেতনা নিয়ে বাঁচবার স্বপ্ন। আমি স্বপ্ন দেখি গারো পাহাড়ের মেননেং নদী তীরে একদিন গারো শিশু প্রথম স্কুলে গিয়ে ভোরবেলা তার আচিক ভাষায় পড়ালেখা করবে, শিক্ষক তার সঙ্গে আচিক ভাষায় গল্প করবেন, গারোদের কত সুন্দর সুন্দর গল্প আছে তা শিশুটিকে শোনাবেন, গারো গান গাইবে শিশুরা সমবেতকণ্ঠে, শিশুটি বাড়ি ফিরে তার বাবা-মাকে এ কথা বলবে, শুনে ওরা অবাক হবে, তাদের সময় তো এরকম ছিল না। আমি স্বপ্ন দেখি আদিবাসীরা এখন থেকে রাষ্ট্রে ছোট ছোট অধিকার ভোগ করতে পারবেন, তাদেরকে ভিন্নতার কারণে অপমানিত হতে হবে না কোথাও, আদিবাসীদের ভূমি জোর করে কেউ কেড়ে নেবে না, আদিবাসী মেয়ের দুঃখ থাকবে না, পাহাড়ে জুম ক্ষেতে পাহাড়ি যুবতী নির্ভয়ে কাজ সেরে ফিরতে পারবে। দিঘীনালায় যে সেটেলাররা চাকমা মহিলার জমি দখল করে রেখেছিল এতদিন, সে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে জমিগুলো ফিরিয়ে দেবে, আর ক্ষমা চাইবে। মায়ামতী জননী হাসিমুখে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। সমাজের সর্বত্র আদিবাসীদের প্রতি মানবিক ভালবাসা জেগে উঠবে, আদিবাসীদের বেদনা সকলকে আহত করবে, ওদের দুঃখে সমভাবে দুঃখী হবে বাংলাদেশ।

এর কোনোটাই ঘটেনি আমাদের জীবনে গত এক বছরে। বরং মধুপুরে ইকো-পার্ক নামে পিকনিক স্পট প্রকল্পের বিরোধিতা করতে গিয়ে পুলিশ ও বনরক্ষীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন গারো যুবক পিরেন স্নাল। তার স্ত্রী সীতা নকরেক এখন শুধু কাঁদেন। তিন বছরের শিশু পুত্র উৎসব ও ছয় মাস বয়সী কন্যা রাত্রি নররেককে নিয়ে জয়নাগাছা গ্রামে। ঘটনার পর পর সীতা নকরেক স্বামী হত্যার প্রতিবাদ জানাতে ঢাকায় এসেছিলেন। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সন্তানসহ দাঁড়িয়ে কোনো কথা বলতে পারেননি। ভাষাহীন মুখে তিনি স্বামী

হত্যার বিচার চেয়েছিলেন গত জানুয়ারী মাসে। সাত মাস হয়ে গেল পিরেন হত্যার বিচার তো দূরের কথা, গারোদের নামে উল্টো ১৫ টি মিথ্যা মামলা ঠুকে দিয়েছে বনবিভাগ। এখন তিন জন গারো নেতা টাঙ্গাইল জেল হাজতে আছেন বিনা অপরাধে। আমরা সবাই জানি, বন বিভাগ নিজেও জানে, সরকার জানে, মন্ত্রী,ডিসি, ডিএফও, টিএনও সবাই জানেন যে, মধুপুরের প্রকল্পটি ইকো-পার্ক প্রকল্প নয়, এটি শুধু মুনাফা ও সম্পদ লুণ্ঠনের প্রকল্পমাত্র। ইতিমধ্যে শত শত একর বনভূমি বেদখল হয়ে গেছে বহিরাগত বাঙালিদের হাতে। আর ওরা কারা ? সবাই জানে, ওরা ক্ষমতাবানদের লোক, বনের জমির লিজের মালিক। বন সম্পদ লুণ্ঠনকারী সবাই একদলের। আমরা দেখি ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা সব সময় লুণ্ঠন করে, আর বিরোধীরা লুণ্ঠনের আশায় থাকে ক্ষমতাবদলের পর। তো আদিবাসীরা যাবে কোথায় ?

এ বছর আদিবাসী দিবসের মূল সুর আমরা ঠিক করেছি আদিবাসীদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার মানবাধিকার। কেননা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার ছাড়া মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না আদিবাসী জীবনে। আদিবাসীদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারের সঙ্গে ভূমির অধিকারও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কেননা আদিবাসী জীবনে মূল অবলম্বন হলো ভূমি। অথচ যুগ যুগ ধরে আদিবাসীরা তাদের ভূমি হারিয়েছে। প্রভাবশালী ভূমিগ্রাসী চক্র ক্রমাগতভাবে ওদের জমিজমা কেড়ে নিয়েছে জোর করে। জাল দলিল দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে, আইনের ফোকর দিয়ে স্বর্বশান্ত করেছে আদিবাসীদের । আর দেশের সরকার, যাদের আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা করার কথা, তারা সবসময়ে শক্তিমানদের সহায়তা করেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে। আদিবাসীরা হয়তো কখনো কখনো আইনের আশ্রয় নিয়েছে, মামলা করেছে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে মামলা চালাতে গিয়ে আরও নিঃস্ব হয়েছে। বছরের পর বছর দরিদ্র আদিবাসী মামলা করে জমি ফেরত পেয়েছে এরকম নজির তো বলতে গেলে নেই। মহাশ্বেতা দেবী তার চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর উপন্যাসে এক মুণ্ডা পহানের মাধ্যমে বলেছিলেন, 'তুই যদি ভালো গোরমেন, তবে আমাদের এত কষ্ট কেন?' বিহারে বড়লাটের ভাই ইংল্যান্ড থেকে বেড়াতে এসেছিলেন এবং মুন্ডাদের গ্রাম ঘুরছিলেন। এই বিদেশী খুব সুন্দর আচরণ করেছিলেন মুন্ডাদের সঙ্গে। তাতেই পহান কথাগুলো বলেন। ব্রিটিশ সময়ে বলা একজন মুন্ডার সে কথাগুলো আজও সমান প্রযোজ্য। প্রতিদিন জমি হারাচ্ছে আদিবাসীরা আর অসহায়ভাবে দেখছে যে তাদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। শুধু ভূমিলোভী চক্র নয়, কখনও

কখনও স্বয়ং সরকার আদিবাসীদের উচ্ছেদ করছে বিভিন্ন প্রকল্পের নামে। ন্যাশনাল পার্ক, ইকো-পার্ক, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, বাধঁ, সামাজিক বনায়ন, মিলিটারী বেইস নির্মাণ ইত্যাদির নামে। বিমান বাহিনীর জন্য ফায়ারিং রেঞ্জ দরকার, দখল করো আদিবাসীদের জমি, রাবার বাগান করতে হবে দাতাদের টাকায়, বেছে নাও আদিবাসী অঞ্চল, ইকো-পার্কের নামে খাসিয়া ও ত্রিপুরাদের উচ্ছেদ করো, মধুপুরে গারোদের নামে শত শত মিথ্যা মামলা দায়ের করো, সিরাজগঞ্জে উঁরাওদের না জানিয়ে গায়ের জোরে আবাসন প্রকল্প করো, পুকুর দখল করো—এই তো আদিবাসী চিত্র সারা দেশের। এমনকি বনবিভাগ সামাজিক বনায়নের নামে চুক্তি করেও আদিবাসীদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। চুক্তিতে বলা ছিল যে, আদিবাসীরা গাছ সংরক্ষণ ও যত্ন করবে এবং বড় হলে গাছ বিক্রির ৬৫% ভাগ টাকা তারা পাবে এবং বাকীটা বনবিভাগ পাবে। কিন্তু দশ পনের বছর কষ্ট করে গাছ পালনের পর বনবিভাগ আদিবাসীদের এ প্রাপ্য শেয়ার দিচ্ছে না। মধুপুরের অনেক আদিবাসী প্রতারিত হয়েছে। দিনাজপুরের সাঁওতালরা গত কিছুদিন আগে বিশাল সমাবেশ করেছে বনবিভাগের প্রতারণার বিরুদ্ধে।

আমি বেশ কিছুদিন আগে কুলাউড়ায় ফুলতলা খাসিয়া পুঞ্জিতে গিয়েছিলাম। এখানে এলাকার ভূমিগ্রাসী চক্রের সঙ্গে বনবিভাগের লোকজন মিলে ফুলতলা খাসিয়া পুঞ্জিটি তছনছ করে দিয়েছিল, লুট করে নিয়েছিল খাসিয়াদের সহায় সম্পদ। গ্রামে ঢুকবার আগে বনবিভাগের গার্ডরা নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল খাসিয়াদের উপর। গুলিবিদ্ধ হয়ে ফুলতলা খাসিয়া পুঞ্জির হেডম্যানের ছেলের এখনও একচোখ অন্ধ। তার চোখের ভেতরে ছররা গুলি এখনও রয়ে গেছে। তার মার বাম হাতে গুলি লেগেছিল, তার মাংস ছিড়ে গেছে। এরকম অনেকেই এখনও শরীরে গুলির স্প্লিন্টার বয়ে নিয়ে বেঁচে আছেন। এত বড় আক্রমণের পরও খাসিয়ারা থানায় মামলা করতে পারেনি, বরং বনবিভাগ উল্টো খাসিয়াদের ওপর মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। হেডম্যানের মা, যার বয়স একশত বছরের অধিক, তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় এবং হাজতে ভরে। তার ভাইকেও পুলিশ ধরে নিয়ে যায়, সঙ্গে একটি যুবতী মেয়েকেও ধরে নিয়ে যায়। ওরা পালাতে পারেনি ওদের বৃদ্ধ মাকে রেখে, তাই ধরা পড়ে সন্ত্রাসীদের হাতে, আক্রমণকারীদের হাতে। এ আক্রমণের পরও ওরা আবার গড়ে তোলে ওদের গ্রাম। ওদের চারজন স্বজন বিনাদোষে জেলে থাকে দেড়মাস। জেল থেকে ফিরে মিথ্যা মামলা কাঁদে নিয়ে দু'জন মারা যায়। ওদের বিরুদ্ধে

অভিযোগ করে বনবিভাগ , খাসিয়ারা গাছ চুরি করছিল। খাসিয়াদের গ্রামে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে, প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে লণ্ঠন করার পর আদিবাসীদের নামেই মামলা হয় গাছ চুরির এবং এ মামলা যথারীতি গ্রহণ করে পুলিশ। এখনও আতংকে আছে ফুলতলার খাসিয়ারা। কারণ ওদের জায়গা স্থানীয় চেয়ামম্যানের নেতৃত্বে যারা দখল করতে চায়, তারা ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় থাকে। থানা পুলিশ তাই জেনেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না।

এরকম ভাবেই বেঁছে আছে আদিবাসীরা বা তারা বেঁচে নেই আসলে কোনোরকম টিকে আছে। যে ভূমিকে তারা মনে করতো তাদের অস্তিত্বের চিহ্ন, এখানে প্রাণেরা জেগে থাকে, তাতে তাদের অধিকার আছে, ভূমিই তাদের জীবন, বাঁচার শেষ অবলম্বন, সেই ভূমির অধিকার তো সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। যে বনকে তারা মনে করতো তাদের এবং পরম মমতায় বনের মধ্যে জীবনকে সাজাতো, সেই বনের উপর তাদের অধিকার তো অস্বীকার করা হচ্ছে। আইএলও কনভেনশন ১০৭ অনুস্বাক্ষর করার পরও কোনো সরকার আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকারকে স্বীকার করে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

আমি গত কয়েক বছর ধরে জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম, ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ইনডিজিনাস পিপলসসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার ফোরাম সভায় অংশগ্রহণ করছি। একটি সভায় ফিলিপাইনের কর্ডিলেরা পিপলস এলায়েন্সের এক মহিলা প্রতিনিধি বলেছেন, আমাদের নিকট থেকে ভূমি কেড়ে নেয়ার অর্থ হলো একটি বাগান থেকে ফুল ছিড়ে নেয়ার মত। ভূমি নেই তো আদিবাসীদের জীবন নেই। ভূমি নেই তো আনন্দ নেই, উৎসব নেই, সংস্কৃতি নেই। ভূমিহীন মানুষ সংস্কৃতিচর্চা করবে কোথায়, তার নৃত্য করার, কথা বলার, গান করার, ভালোবাসার, মনের কথা বলার জায়গা কোথায় ? তাঞ্জানিয়ার এক মাসাই আদিবাসী জাতিসংঘের অধিবেশনে গিয়ে বলেছেন, ভূমিহীন মানুষ হলো স্ট্রাইপবিহীন জেব্রার মতো।

হাওয়াইয়ের এক আদিবাসী বলেছেন, আকাশ, বাতাস, সমুদ্র, নদী, পাহাড়-পর্বত, ভূমি ও প্রকৃতির সাথে রয়েছে আদিবাসীদের নিবিড় সম্পর্ক। তাদের

সংস্কৃতিতে ভূমি হলো মা, অরণ্যের মধ্যে তারা জননীর প্রাণের সন্ধান করেন, তারা প্রকৃতিকে অনুভব করতে পারেন, তারা বন ও সম্পদকে কোনোদিন বেচাকেনার বিষয় হিসেবে দেখেন না, জীবনের অংশ হিসেবে দেখেন। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা বন, সম্পদ, প্রকৃতি সবকিছু ভোগ ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে দেখে। অনেক আদিবাসী বলেছেন, অরণ্য নেই তো জীবন নেই। বাগানের গাছ থেকে ফুল তুলে নিলে যেমন ফুল শুকিয়ে যায়, অরণ্য ধ্বংস হবার ফলে আদিবাসীদের জীবনও আজ বিপন্ন। আদিবাসীদের বনকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে জীবনের অংশ হিসেবে দেখার আহবান জানান।

তবে একটি ভালো খবরও আছে, কোথাও কোথাও রুখে দাঁড়াচ্ছেন আদিবাসীরা। এখন আদিবাসীদের এ নিজস্ব সংগ্রামকে শক্তিশালী করা দরকার। নিজ বাসভূমে পরবাসী দুঃখ ঘুচাতে হলে ভূমি রক্ষার কাজই সবার আগে করা দরকার। যে ভূমিতে সাঁওতাল বাস করেন উত্তরবঙ্গে, সে জমির কাগজ বা দলিলপত্র থাকুক বা না থাকুক, সে জমি ঐ সাঁওতালদের। সরকারের খাতায় সে জমি খাস হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে, কিন্তু আদিবাসী সংস্কৃতিতে সে জমি ঐ আদিবাসীরই। আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকার আন্তর্জাতিক সনদে স্বীকৃত, যার একটি হলো আইএলও কনভেনশন ১০৭ যা বাংলাদেশ সরকারও র‍্যাটিফাই করেছে। সুতরাং যে আদিবাসী মধু-পুরের বনে কাগজপত্রবিহীন ভূমিতে বাস করেন, আনারস-আলু-আদা-পেপে-বাগান করেন, সে জমি বংশপরম্পরায় তাদের। তাদের কাছ থেকে সরকার বা অন্যরা যদি সে জমি জোরপূর্বক কেড়ে নিতে চায়, সেটা হবে আন্তর্জাতিক সনদের লংঘন, যা মানবাধিকার লংঘন হিসেবে চিহ্নিত হবে। খাসিয়াদের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য।

আদিবাসীদের এখন এই স্পিরিটের উপর কাজ করতে হবে। কাগজ পত্র থাকুক বা না থাকুক আদিবাসী অধ্যুষিত জমি, সম্পদ, বন, গাছপালা এসবের মালিক আদিবাসীরাই। খাসিয়া এলাকায় ইকো-পার্ক আন্দোলন করে আমরা একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। সিরাজগঞ্জের তারাশ থানার মাধাইনগরেও আদিবাসীরা জেগে উঠেছেন, উচ্ছেদ হওয়ার উপক্রম হওয়ার পরও তারা সরকারি প্রকল্প ঠেকিয়ে দিয়েছেন। আমি আশাবাদী, মধুপুরেও আদিবাসীরাই জয়ী হবে তাদের সংগ্রামে, অরণ্যের বুকে অর্থহীন দেয়াল

নির্মান বন্ধ হবে, বন্দিদশা থেকে আদিবাসীরা মুক্ত হবে। আদিবাসীরা নিজেরা যে জেগে উঠছেন, এ কাজকেই এখন সবার সহযোগিতা করা দরকার, জীবন মেলাবার কাজ শুরু করা দরকার। এসবই আশার কথা। কিন্তু আদিবাসীরা এককভাবে এ কঠিন কাজে জয়ী হতে পারে না।

তাই প্রগতিশীল মুক্ত-সংস্কৃতিমনা বাঙালিদের আদিবাসীদের পাশে থাকা দরকার। আদিবাসীদের একটু অধিকার দিলে এ রাষ্ট্রের কী এমন ক্ষতি হয় ? বরং আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি, গান, ইতিহাস, গল্প, সাহিত্য নানাভাবে আমাদের এ গরিব দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারে। কিন্তু এসবের জন্য দরকার বাঙালিদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক বিশাল হৃদয়ের কিছু মানুষ, যারা আদিবাসীদের পাশে মানবতাকে ভালোবেসে দাঁড়াতে পারেন ?

চৌদ্দ কোটি মানুষের দেশে এরকম কত জন আছেন? তারা কোথায় আছেন?

লেখক ও সংস্কৃতি কর্মী

বাঙালির মনস্তত্ত্বে আদিবাসী

হায়াৎ মামুদ

১.

'সংখ্যাগরিষ্ঠের দৌরাত্ম্য' বা এ-জাতীয় কোনো ভাবনা বোঝাতে কোনো নৃবিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানী কোনো টার্মিনোলজি ব্যবহার করেছেন কি না আমার জানা নেই। মাথা-গুণতি সংখ্যার আধিক্য কিংবা অল্পসংখ্যকের হাতে অস্ত্রের আধিক্য নিশ্চয় বড়ো রকমের শক্তি–বা সামর্থ বা ক্ষমতা যাই বলি না কেন—যোগায়। অন্যের চেয়ে আমার শক্তি বেশি এই বোধ ঐ শক্তির ফলাফল পরীক্ষা করে দেখতে চায় এবং শেষমেষ একটা সিদ্ধান্তেও এসে পৌঁছুতে চায় হয়ত-বা। যে কোনো সমাজে তার অভ্যন্তরীণ বিন্যাস পর্যবেক্ষণ করলে এই সত্য ধরা পড়বে বলে আমার বিশ্বাস। কেবল এটুকুই নয়, রাষ্ট্রশক্তির মনঃস্বত্ত্বেও যে ঠিক এমনটাই ঘটে থাকে তা বোঝার জন্য আনবিক বোমার উদ্ভাবন ও প্রয়োগ কিংবা গত তিরিশ/চল্লিশ বছর ধরে বিশ্বরাজনীতিতে আমেরিকার মুরুব্বিয়ানা অথবা সাম্প্রতিক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতির উদাহরণ-ই যথেষ্ট। পশুপ্রাণের জৈবধর্মের বোধ (Instimat) গত কারণ সম্ভবত এই রকম আচরণের পিছনে কাজ করে: হায়না খুব হিংস্র হলেও ভীতু প্রাণী, দলবদ্ধ না হলে কোনো শিকার ধরতে পারে না; এক বিঘত আকারের মাছ পিরান হা চির ক্ষুধার্ত ও মহা রাক্ষসী হলেও এত ভয় কাতুরে যে, শ'য়ে শ'য়ে ঝাঁক বেধে না বেরুতে পারলে কোনো শিকারের মুখোমুখি হবে না। পশ্বাচারের ক্ষেত্রে সংখ্যার প্রাবল্যশক্তি টিকে থাকার জন্য পূর্বশর্ত হিসেবে নিশ্চয়ই বহু প্রাণীর কাছে বাস্তবতা। কিন্তু দু'- পেয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারা যে প্রাণীটি চার-পেয়ে পশুর থেকে আলাদা হয়ে গেল প্রায় তিন লক্ষ বছর আগে, সে তো তার পর থেকে পশুত্ব থেকে দূরে সরতে সরতে মনুষ্যত্বের পানে এগিয়েছে। মানুষ হওয়ার বা মনুষ্যত্বের স্পষ্ট ও স্বচ্ছ সংজ্ঞা কিংবা তার চূড়ান্ত প্রকাশ নিয়ে যত তর্ক বা মতবিভেদ থাকে থাকুক, কিন্তু একটি ব্যাপারে নিশ্চয় সকলে একমত হবেন যে মানবগোষ্ঠী এখনও চলিষ্ণু; বিগ্ ব্যাংগ (Big Bang) সাদৃশ্য মহাজাগতিক প্রলয়নাদে বিশ্বপ্রপঞ্চ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত মানুষের স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব, সামনে বা পিছনে বা আগু-পিছু তালে তাকে চলতেই হবে। তা হলে পূর্বাপর বিবেচনায় ও সভ্যতার

গতিধারার আলোকে এই প্রত্যাশাই নিতান্ত যুক্তিযুক্ত হয় যে মানবসমাজের চলাটা 'মনুষ্যত্ব' অর্জনের দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য—তা সে-মনুষ্যত্ব শব্দের সংজ্ঞা ও মূল্যবিচার যেমনই আপেক্ষিক বা তর্কসম্ভব হোক না কেনো। মনুষ্যত্বে সাধনা তাই সর্বদাই শক্তিমদমত্ততার বিপরীতে অবস্থান নেয়। তাই যদি না হত, তবে সভ্যতার ইতিহাসে গৌতম বুদ্ধের চেয়ে চেঙ্গিস খানের গুরুত্ব বেশি হত।

কিন্তু সম্ভবত মনুষ্যস্বভাবের মধ্যেই এমন কিছু ধ্বংসবীজ রোপন করে দেওয়া আছে যে মানুষকে সে-সবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতেই 'মানুষ হওয়া'র দিকে এগোতে হয়। এ দেশীয় শাস্ত্রঙ্গনে ওগুলোকেই 'ষড়রিপু' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে আমার ধারণা। খোসা ছাড়ালে দেখা যাবে, সকল রিপুরই সারাৎসারে শক্তির প্রতাপ সম্বন্ধে একটা ধারনা লুকিয়ে রাখা আছে, কারণ কোনো রিপুরই প্রকাশ বলপ্রয়োগ ও কর্তৃত্ব ঘোষণা ব্যতীত সম্ভব নয়। মানুষই যেহেতু সভ্যতা গড়ে, আবার ভাঙ্গে তাই মানুষ একই সঙ্গে ষড়রিপুর দাসও বটে, আবার ষড়রিপুজয়ী বটে। বিষয়টি একমুখীও নয়, একরৈখিকও নয়, যথেষ্ট জটিল ও বিস্তৃত।

শেষ বলবার কথাটা সংক্ষেপে এমনটাই দাঁড়ায় যে, শক্তিমন্ত মানুষ বা সমাজ বা রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে সভ্য হতে হতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মহিমা স্পর্শ করতে পারবে, অথচ এই সমগ্র যাত্রাপথে তার প্রবলতম বাধা তার ভিতর থেকেই গজিয়ে ওঠা—তার শক্তি। শক্তিমান তার শক্তির দম্ভ প্রকাশ করবে, এর চেয়ে কঠিন আত্মশাসন খুব কমই আছে।

২.

এই প্রস্তাবসার প্রয়োজন পড়ল নিজের কাছেই এ কথা পরিষ্কার করে বোঝাতে যে বাংলাদেশ যেহেতু বাঙালিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই বহুত্বের সংঘবদ্ধ শক্তির দৌরাত্মপ্রকাশকে অস্বাভাবিক বলা যাবে না, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও প্রমাণিত হয়ে যায় যে সে এখনও 'সভ্য' হয়ে ওঠে নি এবং মনুষ্যত্ববোধের চর্চা তার আচরণে স্পষ্ট নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের উপলব্ধিতে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে যে বাস্তবতা ধরা পড়ে তার ধর্বে/ভ্রান্তি নেই; কিন্তু সে মনুষ্যেচিত সভ্য নয় বলে বুঝতে পারে না যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতালিপ্সা তাকে বর্বরতায় নামাবে, নীতিজ্ঞানহীন পশুতে ডোবাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের অহংবোধ তাকে ভুলিয়ে দেয় সংখ্যালঘুর প্রতি মমতা ও দায়িত্ববোধই হল তার চারিত্রশক্তি ও নৈতিকতা। বাংলাদেশের

সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্ঠি বাঙালির সবচেয়ে বড়ো শত্রু তার ঐ আত্ম-অহমিকা যে মাথাগুণতিতে সবচেয়ে দলে ভারী সে এবং সে তখন তার বাইরে অন্য কাউকে আর দেখতেই পায় না বা দেখতেই চায় না। শক্তির গুরুভাবে সে তারচেয়ে যেই দুর্বল তাকেই পিষে মারতে চায়।

দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার বাংলাদেশ নামে এই রাষ্ট্রের সমাজদর্শনে কতখানি দৃঢ়মূল তা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচার-ব্যবস্থা, শিক্ষাপরিস্থিতি, জনসাধারণের সামাজিক ও রাজনৈতিক আচরণ; সংসদে অভ্যন্তরে ও বাইরে রাজনীতিকদের বক্তব্য ইত্যাদি নিতান্ত সাদা চোখে দেখলেও তাতে বোঝা যায়। রাষ্ট্র ও সমাজের এই চেহারার জন্য যারা দায়ী তারা বাঙালি তো বটেই, তারও বেশি—বাংলাদেশী বাঙালি এবং তারাই এ রাষ্ট্রের পরিচালক। আমাদের এমন সর্বব্যাপী শক্তির দাপট আমাদের যে চোখে পড়ছে না তার কারণ সংখ্যাগুরুর অহং ও তজ্জাত অন্ধত্ব। বাইরের বিশ্ব আমাদের অসভ্যতা, দুর্নীতি, অপশাসন, ধর্মান্ধতা, মানবাধিকার লজ্ঘন ইত্যাদি নিয়ে সমালোচনামুখর এবং আমরা কোনো কিছুতেই আর লজ্জা পর্যন্ত পাই না, পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশ আমাদেরকে আর তাদের সমপর্যায়ভুক্ত যে ভাবছে না সে বুদ্ধি বা বোধ বিপর্যস্ত করে দিয়েছে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তিদম্ভ।

৩

বাঙালির মনস্তত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠের মনস্তত্ত্ব। সেখানে তার কারোরই অস্তিত্ব নেই তার নিজেকে ছাড়া। ঘটনাটি একইসঙ্গে অন্ধত্ব ও বিবেকহীনতা, অথচ সে তা বোঝে না।

একটি ঘটনার কথা মনে হলে এখনও কষ্ট পাই। জিয়ার শাসনামল তখন। পার্বত্য চট্টগ্রামে খুবই অশান্ত অবস্থা, অঘোষিত যুদ্ধ চলছে পাহাড়ী অধিবাসী গেরিলাদের সঙ্গে। সরকার বেকায়দায় আছে এবং তার বাহ্যিক বীরত্বপ্রকাশের ভিতর দিয়েই তেরপল-ঢাকা জলপাইরঙা গাড়ি রোজই চাটগাঁ সেনানিবাসে রাত থাকতে-থাকতে গিয়ে ঢোকে। আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের এ কথা সেদিন বোঝাতে পারি নি যে, অন্যায়টা আমাদের, বাঙালিদের এবং ঐ যুদ্ধ অনৈতিক—আমাদের দিক থেকেই, পাহাড়ীদের দিক থেকে নয়। আমার নিজের মত এখনও পাল্টায় নি। আমি এও দেখতে পাচ্ছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামেই শুধু নয়, এখন সংখ্যাগুরু বাঙালির অত্যাচারের অভ্যাস আরো পরিব্যাপ্ত হয়েছে; কোথায় নয়? বাঙালি অত্যাচার করছে মধুপুরের গড়ে,

সিলেট, উত্তরবঙ্গে, পটুয়াখালিতে, সবখানে। এর মূল কারণ হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার ও রাজনৈতিক দস্যুতাকে আঙুল উঁচিয়ে দেখানো খুব সোজা। যে কেউ সেটা পারেন এবং যিনিই যখন বিরোধী রাজনৈতিক দলে থাকবেন তিনিই 'যত দোষ নন্দ ঘোষ; বলে .....দলের ঘাঁড়ে দোষ চাপাবেন, এটিও কোনো মহৎ কর্ম নয়। আসল অসুখ হল সংবেদনহীণতা। সংখ্যালঘু যে, সে তার লঘুত্বের কারণেই সংখ্যাগুরুর কাছে দুর্বল। দুর্বলের জন্য হৃদয়ে তার কোনো মমতা নেই; এই অসংবেদনার পাপ হয়ত সে সবল বলে বোঝে না, কিন্তু তার ফলে পাপ তো আর পুণ্য হয়ে যায় না।

যে প্রান্তিক, যে দূরের, যে আমার চেয়ে হীনবল—তা যে কারণেই হো না, তার রক্ষনাবেক্ষণের নীতিজ্ঞান রাষ্ট্রের কাছে প্রত্যাশিত এবং সভ্য দেশে আইন প্রণয়ন সেভাবেই হয়ে থাকে। বাংলাদেশে যে তা হতে পারে নি তার একমাত্র কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের কূপমন্ডুকতা ও তার বাঙারি জাতিসত্তার আত্মধ্বংসী অহঙ্কার। এই দেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠি দেশের জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ এবং তা এতই নগন্য যে দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়—এমন হৃদয়হীত ও যৌক্তিক কথা বলার লোক এ দেশে নিশ্চয়ই যথেষ্ঠ। কিন্তু ক্যান্ত মানুষ না দেখে মৃত সংখ্যার শতকরা হিসেবে নিয়ে ব্যস্ত লোকটিকে তো অপচায়িত মেধা, কলুষিত হৃদয়, দুর্বৃত্ত ছাড়া অন্য কিছু বলা যাবে না। আমাদের লজ্জা এখানেই যে, আমরা প্রায় সকলে—শুধু আমার বাঙালিত্বের সুবাদে—ঐ দলের মধ্যে পড়ে যাই।

সাঁওতাল মাতৃভাষার অনিল মারান্ডি তার এক ভাষণে এক মর্মান্তিক সত্য উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "আপনারা জানেন যে, জীববিজ্ঞানীরা জীব আবিষ্কার করতে গিয়ে ব্যাঙের সমস্ত শরীরকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। ঠিক তদ্রুপ নৃবিজ্ঞানীরা আদিবাসীদের জাতিতে রূপান্তর করতে গিয়ে তাদের মাংসকে টুকরো টুকরো করে শেষ করে দিচ্ছে, কিন্ত আমরা তাদের অবস্থার কোন উন্নয়ন লক্ষ্য করছি না। আজকে এখানে বহু ডক্টর আছেন তাদের কাছে বিনীতভাবে আমাদের আবেদন এই আদিবাসীদের আর কাটবেন না। এই অদিবাসীদের রক্ষা করুন। এই অদিবাসীদের বাঁচাতে চাই, অদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চাই। আপনারা তাদের চামড়া কেটে অনেক বড় জায়গায় চলে গেছেন, ডক্টরেট ডিগ্রি করেছেন, কিন্ত আদিবাসী যেখানে ছিল সেই জায়গাতেই অবস্থান করছে।" ২০০১ সালে উচ্চারিত তাঁর পর্যবেক্ষন আদিবাসী সমাজের যে দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনার ছবি হাজির করে র্বতমান

২০০৫ সালের অবস্থা তার চেয়ে অনেক খারাপ। দেশের সরকার যেহেতু বেনিয়া মুৎসুদ্দি ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের দখলে তাই আদিবাসীদের ওপর অর্থলোলুপ ক্ষমতাবানদের অত্যাচার বহুগুণ বেড়েছে এবং নিপীড়ন -নির্যাতন-হত্যা-ধর্ষণে ও জমি দখলে অতিষ্ট এইসব সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অনেকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। রাষ্ট্রশক্তি যাদের দখলে তারা এতে খুশি, কারণ এতেই তাদের লাভ, এটিই তারা চায় । কিন্ত সাওতাল জনগোষ্ঠীর ঐ প্রতিনিধি এই পাঁচ বছরে একটি উন্নতির চিহ্ন হয়তো দেখতে পেয়েছেন, আর সেটাই অনেকটা আশ্বস্ত হওয়ার মতো। তা হল আদিবাসীদের পাশে এসে অনেক সচেতন গণতন্ত্রমনা দেশপ্রেমিক বাঙালী তাদের শামিল হয়েছেন, আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, সরকারী নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা জোরদার হচ্ছে।

পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা আনুমানিক ২৫ লক্ষ। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত তথ্যাদি ও ব্যক্তিগত অজ্ঞিতা বলছে যে, এরা সকলেই প্রবলভাবে শোষিত ও শাসিত, আর ইতিহাসের নিরপেক্ষ দৃষ্টি জানিয়ে দিচ্ছে যে, এসব জনগোষ্ঠিতে যত জাতি সত্ত্বা আছে তারা নিজ নিজ জায়গাতে অনাদি কাল থেকেই স্থায়ী বাসিন্দা এবং এমনকি বাঙালি নামে চিহ্নিত জাতিটি এখনকার বর্তমান চেহারা নিয়েছে ঐ সব আদিবাসীর বহু ভাষা থেকে শব্দ, বহু সামাজিক প্রথা থেকে লোকাচার ইত্যাদি আত্মসাৎ করে। সর্বাগ্রে প্রয়োজন, আমাদের-সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগনের হৃদয় পরির্বতন। প্রথমে ব্যক্তিমানুষের, সেখান থেকে ছড়াবে সমাজের অভ্যন্তরে; আর পরিশেষে, ব্যক্তি ও সমাজের দাবিতে ও চাপে রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ পরিবর্তিত হবে। নৈতিক দায় বাঙালিরই।

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের আদিবাসী : ভাষা-সংস্কৃতি-শিক্ষা

সৌরভ সিকদার

বাংলাদেশের আদিবাসীদের সঠিক সংখ্যা কত এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। এমনকি সরকারী জনগণনার হিসাবেও আদিবাসীদের প্রকৃত জনসংখ্যার কোনো চিত্র নেই। ১৯৯১ সালের জনগণনার হিসাবে ২৯টি আদিবাসীদের নাম উল্লেখসহ মোট জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ১২,০৫৯৭৮। এটি নি:সন্দেহে পূণাঙ্গ তথ্য নয়। বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডে এই সংখ্যা নি:সন্দেহে দ্বিগুন। অন্যদিকে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম প্রকাশিত স্মরনিকায় (২০০৩) ৪৫টি আদিবাসী জাতির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের আদিবাসীদের বিষয়ে রাষ্ট্রের আগ্রহ ও মনোভাব এই তথ্য বিভ্রাট থেকেই স্পষ্ট হয়। সে সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাংগঠনিক ভাবে আদিবাসীরা তাদের জাতিগত স্বীকৃতি আজও পায়নি। বর্তমানে সংবিধানের ৬ নং অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে,—'বাংলাদেশের নাগরিক মাত্রেই বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন'। অর্থাৎ বাংলাদেশের বাসিন্দা ও নাগরিক মাত্রই বাঙালি। এরূপ রাষ্ট্রি ধোরী পরিবেশে আদিবাসীদের ভাষা সংস্কুতি বিপন্ন হবার উপক্রম। বাংলাদেশের বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি প্রভাব আদিবাসীদের ভাষা ও সাংস্কৃতিতে পড়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বর্তমান বক্তব্যতা বিশ্লেষণ করলে শঙ্কিত না হবার কোনো কারণ নেই যে ক্ষুদ্র জাতি সত্তার ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হতে হতে বিলুপ্তির পথে।

ভাষা

বাংলাদেশে ৪৫টি আদিবাসীদের মধ্যে প্রায় ৩০টি পৃথক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ভিন্ন চিত্র ভাষা প্রচলিত আছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ভাষা হচ্ছে সাওতাল, চাকমা, তন্‌চংগ্যা মারমা, গারো (মান্দি), ত্রিপুরা (ককবোরক), ওরাঁও (কুড়ুঁখ), খেয়ায়, থুমি, লুসাই, মুন্ডা, মণিপুরী (মৈতেই ও বিষুপ্রিয়া) মুরং, পাংখো, পাহাড়ি, খাসিয়া প্রভৃতি। এ ভাষাগুলো পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাপরিবারের সদস্য। যেমন—ইন্দোইউরোপীয়, সাওতাল-অষ্ট্রেতমিয়াটিক, ওরাঁ—দ্রাবিড়ীয়, মারমা—তির্ব্বত-ধর্মী ইত্যাদি পরিবার ভুক্ত। বাংলাদেশের

অধিকাংশ আদিবাসীর নিজস্ব মাতৃভাষা থাকা সত্ত্বেও এরা সবাই তাদের প্রয়োজনে দ্বিতীয় আর একটি ভাষা অর্থাৎ বাংলা জানে বা লিখতে বাধ্যহয়। যেমন সাওতাল, চাকমা, ও গারোরা। তবে এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত যারা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী তারা তিনটি ভাষা জানে অর্থাৎ এরা বহুভাষী। যেমন বান্দরবনের খুমীরা মারমা এবং বাংলা জানে উত্তরবঙ্গের (রংপুর জেলার) অনেক ওঁরাওরাও জানে বাংলা ও সাওতালি বা সাদরি ভাষা। বাংলাদেশের খুব কম অদিবাসীই আছে যারা নিজের ভাষা জানে শুধু।

সাওতাল চাকমা, মারমা, গারো, ত্রিপুরা এই প্রধান পাঁচটি আদিবাসী জাতির ছাড়া অন্যদের ভাষার অবস্থা তেমন ভালো নেই। বলা যেতে পারে বিপন্ন দশা। ঘরের মধ্যে ছাড়া তাদের মাতৃভাষা চর্চার সুযোগ নেই বললেই চলে। তাছাড়া নতুন প্রজন্মের আদিবাসী সন্তান শিক্ষার সুযোগ কিছুটা লাভ করার কারণে জীবন-বাস্তবতার তাগিদে নিজের ভাষার চেয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলা অথবা আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি চর্চাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। সেই সঙ্গে যে সমস্ত আদিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে শহরে বসবাস করে আসছে—পারিপার্শিকতার কারণে বলা যায়—তাদের মাতৃভাষা তারা ভুলতে বসেছে।

পরিবর্তনীশল বিশ্বে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। আমাদের আদিবাসীদের ভাষার পরিবর্তন যদি লক্ষ করি তাহলে দেখবো—তিন ধরণের পরিবর্তন ঘটছে (ক) উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটছে (খ) শব্দভাভারে বাংলাভাষার সমকালীন শব্দসমূহ ঢুকে যাচ্ছে (গ) নিজস্ব লিপি না থাকায় মাতৃভাষায় লিখিত সাহিত্য (রচনা) অত্যন্ত সীমিত হয়ে যাচ্ছে। আর যাদের লিপি আছে তারা সে লিপির চর্চা না করার কারণে ভুলে গেছে। যেমন চাকমাদের নিজস্ব লিপি (ওঝাপাতা) থাকা সত্ত্বেও এদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জনই জানে না বা চেনে না লিপিটি। ফলে ইদানিং কালে যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হচ্ছে তার সিংহভাগই বাংলা হরফে। বিজু উৎসবের (চাকমাদের নববর্ষ উৎসব) এ সময় রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি থেকে যে সংকলনগুলো প্রকাশিত হয় (সাঁওতাল, গারো এবং তনচংগ্যা ছাত্র সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে।)—সেগুলো দেখলেই বোঝা যাবে আমার বক্তব্যের সত্যতা। অন্যান্য আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য। তবে উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল এবং ময়মনসিংহের গারোদের একটি অংশ (মিশন কেন্দ্রিক) রোমান হরফে বা অক্ষরে ধর্মীয় গুণকীর্তনমূলক গান-কবিতা প্রভৃতি রচনা করে থাকে। অপেক্ষাকৃত স্বল্প জনসংখ্যার আদিবাসীদের ভাষার অবস্থান আরো খারাপ।

ওরাল বা মৌখিক সাহিত্য, যাদু মন্ত্র, ভেষজ চিকিৎসা প্রণালী ছাড়া সংরক্ষণ উপযোগী আর কিছু রচিত হচ্ছে না বললেই চলে। প্রাকৃতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থানগত কারণেই ভাষাগুলো আস্থা নিঃসন্দেহে বিপন্ন। এভাবে চলতে থাকলে বর্তমান পৃথিবীর ভাষিক বৈচিত্র্যের অসাধারণ নির্দেশন এ ভাষাগুলো হয়তো অচিরেই মুছে যাবে মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে। বিপন্ন ভার এই তালিকার বাংলাদের যে ভাষা সমূহের নাম উল্লেখ করা যায় সেগুলো হচ্ছে—চাক, বুম, খুমি, পাংখো, খেয়াং লুসাই, কুড়ুখ মুরো প্রভৃতি। এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দ্যোগ না নিলে পৃথিবীর বুক থেকে নিচিহ্ন হয়ে যাওয়া ভাষার তালিকায় একসময় যোগ হবে। এ নামগুলোর জন্য অবশ্য আদিবাসীদের নিজেদেরও আত্মসচেতন হওয়া জরুরী।

সংস্কৃতি

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি আদিবাসী জাতির-ই রয়েছে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যে লালিত আপন সংস্কৃতি। কারো কারোটি আবার হাজার বছরের অধিক পুরাতন এ সমৃদ্ধ। আমাদের বর্তমান/বিদ্যমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং উন্নতির জন্য কোনো গঠনমূলক কার্যক্রম নেই। এমনকি বাঙালি মনস্তত্ত্বে ও (ব্যতিক্রম অবক্ষয় আছে) আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্ব রয়েছে। কাজেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আদিবাসী সংস্কৃতির বাঙ্গালিকরণ চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। এর জন্য যে শুধু বাঙ্গালিরাই দায়ী এমন নয়, আদিবাসীদের একটি অংশ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছে। সংস্কৃতি যেহেতু মানুষের জীবন ধারা ও দৈনন্দিন অভ্যাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত কাজেই জীবন-জীবিকার বদলের ফলে সংস্কৃতিতে তার প্রভাব পড়া মোটেও অস্বাভাবিক নয়। ১৯৬১ সারে কাপ্তাই বাঁধ নির্মানের ফলে যখন ঠিকই এলাকা প্লাবিত হয় তখন সেখানে বসবাসকারী চাকমা ও অন্যান্য আদিবাসীদের সরে আসতে হয়। এর ফলে তাদের ঐতিহ্যবাদী ও জীবিকা নির্ভর জুম চাষ বাধা গ্রস্থ হয়। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জুম চাষ উপযোগী পর্যাপ্ত জমি না থাকায় পাহাড়ে বসবাসরত আদিবাসী-রা ক্রমে সরে আসে এ পেশা থেকে। ফলে সংস্কৃতিতে এর প্রভাব পড়ে। জুম চাষ সম্পৃক্ত বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান এখন আর আগের মত পালিত হচ্ছে না। সভ্যতার বিবর্তন ও নাগরিকতার ছোয়ায় পোশাক-আশাক খাদ্যাবাস এমনকি নাম করনের ক্ষেত্রেও আদিবাসী সংস্কৃতিতে ব্যপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এখানে উলেখ করা প্রয়োজন মিশনারীদের ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া ও আদিবাসী

সংস্কৃতির পরিবর্তনে বা নিজস্বতা হারাবার জন্য কম দায়ী নয়। পূর্বে সনাতনধর্মী যে সাঁওতালরা মোগরাই কারাম পালন করতো তারা এখন বড় দিন পালন করে। মারও বোঙলার পরিবর্তে যীশুকে নিয়ে গান করে। নাম করণেও খ্রীষ্টান প্রভাব স্পষ্ট। শুধু সাঁওতাল কেন গারো এবং পাহাড়ের বসবাসরত বম খুমি ম্রোদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভৃতি উন্নতি এবং গণমাধ্যম বিশেষ করে টিভি চ্যানেলগুলো বাঙালি সংস্কৃতি প্রচার আদিবাসীদের সংস্কৃতিক জীবন ও রুচিতে প্রভাব বিস্তার করছে সে কারণে ছাড়িয়ে যাচ্ছে আদিবাসীদের লোক সাহিত্য ছাড়া গান নাটক এমনকি বাদ্যযন্ত্র। আর এ কারণে প্রত্যন্ত গ্রামে বা আদিবাসী পাড়ায় অবলীলায় বেজে চলে সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত বাংলা গান। দেশে বেশ কয়েকটি আদিবাসী সাংস্কৃতি ইন্সটিটিউট থাকলেও (টিসিআই) আদিবাসী সংস্কৃতি সংরক্ষন, সম্প্রসারণে তাদের ভূমিকা খুবই নগন্য। বরং বাংলাদেশের জাতীয় দিবসগুলোতে যেমন ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা বা বিভাগীয় শহবে নির্ধারিত আদিবাসী নৃত্য প্রদর্শনের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণই যেন তাদের প্রধান কাজ। এর বাইরে বড়জোড় বছরে দু একটা সভা সেমিনার করে হারিয়ে যেতে বসা আদিবাসী সংস্কৃতির জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলা।

কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা ভূখন্ডে যখন বৃহৎ জনগোষ্ঠির পাশাপাশি ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা বাস করে তখন স্বাভাবিকভাবেই বৃহৎ সংস্কৃতির প্রভাব পড়বে অন্যদের উপর। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু ক্ষুদ্র জাতিস্বত্ত্বার সংস্কৃতিকে রক্ষা করার দায়িত্বও পড়ে বৃহত্তের কাঁদে। এ দায়িত্ব বিষয়ে আমরা আগে সচেতন কিনা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উপস্থাপন মোটেও অসঙ্গত নয়। এমন কী আদিবাসীদেরও নিজের সাংস্কৃতিক অধিকার সচেতনতা এবং তাকে রক্ষার দৃঢ় প্রত্যয় থাকা আবশ্যক।

শিক্ষা

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার এই মৌলিক অধিকার তেকে বাংলাদেশের আদিবাসী শিশুরা সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। বিশেষ করে মাতৃভাষায় তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না তাকায়। বাংলাদেশের আদিবাসী শিশুদেরকে মাতৃভাষা ভাল করে শিখার আগেই বিদ্যালয়ে গিয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলার মাধ্যমে পাঠ গ্রহণ করতে হয়। অথচ আই এল ও'র ৪০ তম অধিবেশনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে আদিবাসী শিশুদেরকে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করার কথা।

পার্বত্য শান্তিচুক্তির (খ) অনুচ্ছেদের ৩৩ নং ধারায় পাবর্ত্য চট্টগ্রামে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের অঙ্গীকার করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বেসরকারী পর্যায়ে N.G.O দু একটি উদ্যোগের কথা বাদ দিলে আদিবাসীদের মাতৃভাষা শিক্ষাদানের বিষয়টি রাষ্ট্র পরিচালকদের কাছে কোনো গুরুত্ব-ই পায়নি। এমন কী সর্বশেষ মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেও উপেক্ষিত হয়েছে আদিবাসীদের শিক্ষার অধিকার। এর ফলে যা ঘটছে তা হচ্ছে—(ক) আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মৌলিক জ্ঞান লাভের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে (খ) ভাষাগত কারণে শিক্ষার ভিত্তি দূর্বল হয়ে পড়ছে (গ) তাদের সৃজনশীল চিন্তা ও কল্পনা শক্তির বিকাশ বাধা গ্রস্থ হচ্ছে (ঘ) তুলনামূলক প্রতিযোগিতায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে তারা পিছিয়ে পড়ছে। ভাষা গত সমস্যার কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাদের ঝড়ে পড়ার (dropout) হার বেশি। এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যাদের নিজস্ব অক্ষর বা লিপি নেই তাদের ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদান একটি প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই। তবে তাদের সম্মতি নিয়ে বাংলা কিংবা রোমান হরফে এ সমস্যার সমাধার করা যায়। প্রয়োজন সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা না হলে নাইজেরিয়ার মত উন্নয়নীশল দেশে ২৪টি আদিবাসী ভাষায় প্রথামিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে—যাদের অধিকাংশেরই নিজিস্ব লিপি নেই। প্রতিবেশি দেশ ভারতের ত্রিপুরায় মাধ্যমিক পর্যায়ে ককবোরক ভাষায় পাঠ দান চলছে। এ সমস্ত পদক্ষেপের পাশাপাশি শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হলে দরিদ্র আদিবাসী শিক্ষার্থীর জন্য অধিক হারে বৃত্তির প্রচলিত করা, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের জন্য কোটা বৃদ্ধি করাসহ আদিবাসী শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলতে চাই আমরা যদি আদিবাসী পল্লির ঘরে ঘরে শিক্ষা তথা জ্ঞানে আলো পৌঁছে দিতে চাই, ভাষিক ও তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে চাই—তাহলে রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে সবার আগে। সেই সঙ্গে সংখ্যাগুরু বাঙালিকে হতে হবে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আর নিজের অধিকার অস্তিত্বের সংগ্রামে সপ্ন ও প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, নেতৃত্ব দিতে হবে অধিবাসীদেরকেই। একদিন নিশ্চয়-ই উত্তরবঙ্গে প্রত্যন্ত সাঁওতাল পল্লী থেকে কেওক্রাডং পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে স্বপ্নের বীজ।

সহকারী অধ্যাপক
ভাষাতত্ত্ব বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বনভূমি ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ ধ্বংসের নেপথ্য কারণ

শ্রী প্রগতি খীসা ধ্বজা

ছোট বড় অসংখ্য পাহাড় পর্বত পরিবেষ্টিত আমাদের এই পার্বত্য চট্টগ্রাম। সারা পার্বত্য চট্রগ্রাম জুড়েই সারি সারি বৃক্ষরাজি। হাজার হাজার মাইল এলাকা বিস্তৃত বন-বনান্তর । প্রকৃতির শ্যামল শ্যামলিমায় শোভিত বনাঞ্চলের ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা আনন্দ কল্লোলে কতই দিব্যি সুখে ধন ধান্যে বসবাস করত আমাদের পাহাড়ী মানুষ, আদিবাসীরা। লোক সংখ্যা ছিল কম, ছিল প্রচুর বন, পাহাড়, আবাদযোগ্য ধান্য জমি আর উর্বর জুম চাষের উপত্যকা জাতীয় পাহাড়। যৎসামান্য জায়গা জুম চাষ করলে সারা বৎসরের খোরাকী পাওয়া যেত অনায়াসে। বৎসরের ছয় মাস কাজ করে জুমের ফসল ঘরে তোলা যায়। আর বাকী ছয়মাস মেয়েদের জুম থেকে পাওয়া তুলা ধুনে কাপড় চোপর বানানো ছাড়া অন্য কোন কাজ ছিল না। পুরুষরা দল বেঁধে বুনো পশু শিকারে বেরিয়ে পরতো বন-বনান্তরে। পাহাড়ী ঝর্ণায় পাওয়া যেত প্রচুর চিংড়ী, মাছ, কাঁকড়া ও বড় বড় টাংজাঙ্যা ব্যাঙ, বাগোই মাছ। জুম চাষের সুস্বাদু ভাত আর শিকারের মাংস,প্রোটিন- আমিষ জাতীয় খাদ্য খেয়ে সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল প্রকৃতি কোলের মানব সন্তান আদিবাসী মানুষ।

১৮৭১ সালে আদিবাসী জনগোষ্ঠির লোক সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৬৩,০৪৫ জন। আদিবাসীদের স্বর্গরাজ্য এই পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন অদিবাসী বাঙালীর বসবাস ছিল না। ১৯৪৭ সালে বা (১৯৪৭−১৮৭১) ৭৬ বছর ব্যবধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার ৩% ভাগের কম জনসংখ্যা বাঙালির আগমন ঘটে পার্বত্য চট্টগ্রামে । ১৯৫১ সালে মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় ২,৮৭,০০০ জন, ১৯৭৪ সালে ৫,০৮,১৯৯ জন এবং ১৯৯১ সালের আদমশুমারী মতে মোট জনসংখ্যা ৯,৬৭,৪২০ জন। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে আধিবাসী পাহাড়ী বাঙালীর ব্যবধানের অনুপাত (৫১:৪৯) । ফলে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, আগামী ৫০ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী জনসংখ্যা ৩ গুণ বৃদ্ধি পাবে আর আধিবাসীরা পরিণত হবে ছিন্নমূল প্রান্তিক জনগোষ্ঠিতে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বন ব্যবস্থাপনার ইতিহাসঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপুল বনজ সম্পদই এ অঞ্চলের আদিবাসীদের কাল হয়ে দাঁড়ায় । স্বাধীন চাকমা রাজ্যে নানাভাবে হস্তক্ষেপ করতে উঠে পরে লাগে বৃটিশ সরকার । ১৮৬০ সালে চট্টগ্রাম থেকে বিভক্ত করে নতুন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন করে ইংরেজরা । ডিস্ট্রিক্ট সুপারিণটেনডেন্ট পদবীর একজন ইংরেজ কর্মকর্তা এ নূতন গঠিত জেলার প্রধান প্রশাসক নিযুক্ত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে করায়ত্ব করে নেন ।এর দু বছর পর ১৮৬২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ দ্রব্যের রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রধান প্রধান নদীপথে টোল ষ্টেশন স্থাপন করা হয়। পরে ১৮৬৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বনজ সম্পদের দায়িত্বে একজন সহকারী বন সংরক্ষক নিয়োগ করা হয় । অত:পর ১৮৭১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে বন বিভাগ টোল ষ্টেশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় শুরু করে। ১৮৭১ সালের তৎকালীন ইংরেজ সরকার বার্মা (মায়ানমার) থেকে বীজ আমদানী করে কাপ্তাই সংলগ্ন কর্ণফুলির মোহনায় রামসীতা পাহাড়ে সর্বপ্রথম সেগুন বাগান সৃজনের উদ্যোগ গ্রহন করেন । ১৮৭১ সালের ১ লা ফেব্রয়ারী ১৮৬৫ সালের vii নং আইনের ২ ধারা মোতাবেক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের ৬,৮৮৫ বর্গমাইল ভুমির মধ্যে ৫,৬৭০বর্গমাইল ভুমিকে সরকারী সংরক্ষিত বন ঘোষনা করা হয়। ১৮৭৫ সালে পাক-ভারত বৃটিশ বাংলায় বন সংরক্ষক উইলিয়াম শ্লিচ পার্বত্য চট্টগ্রামের বন বিভাগ ও বন ব্যবস্থাপনা পরিদর্শনে এসে বন প্রশাসন ও টোল স্টেশনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় পদ্ধতির কড়া সমালোচনা করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বন প্রশাসকের উপর চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ঐ সময় চট্টগামের কমিশনার পদাধিকার বলে ঐ সময়ের বন সংরক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সহকারী বন সংরক্ষক ডেপুটি কমিশনারের নিকট দায়বদ্ধ ছিলেন । মি: শ্লিচ মন্তব্য করেন এই সময় নিয়ন্ত্রনহীন কর্তনের ফলে বনের দ্রুত ক্ষতি সাধন হচ্ছে এবং সুগম এলাকা থেকে জারুল-দেবদারু ও তুনের ন্যায় মূল্যবান প্রজাতির বৃক্ষরাজি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে বলে এর প্রতিরোধ গ্রহন করা জরুরি বলে মন্তব্য পোষণ করেন । তিনি এসব ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য সরকারে নিকট নিম্নলিখিত সুপরিশমালা পেশ করেনঃ-

১। সংরক্ষিত (Reserve) ও জেলা (District Forest) এই দুই শ্রেনীর বনকে বিভক্ত করা ,

২। সংরক্ষিত বন সম্পূর্ণ বন বিভগের নিয়ন্ত্রনে থাকবে এবং জেলা বন থাকবে জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রনে।

৩। জনগন তাদের প্রয়োজনীয় কাঠ জেলা বন থেকে জেলা প্রশাসক কর্তৃক সময়ে সময়ে আরোপিত বিধি নিষেধ মেনে সংগ্রহ করতে পারবে এবং স্থানীয় মৌজা হেডম্যান বা স্থানীয় আদিবাসীগণ তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য বন সৃজন ও সংরক্ষণ করতে পারবে। মিঃ শ্লিচ সাহেবের এই সুপারিশমালা চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সমর্থন করেন এবং সরকারী অনুমোদন লাভ করে । ১৮৭৫ সালে মেয়নী (মায়নী) নদীর অববাহিকায় ৩৩৯ বর্গমাইল এলাকা সর্বপ্রথম সংরক্ষিত বন ঘোষনা করা হয়। এর পর রাম-সীতা পাহাড় ও রেঙখ্যং সংরক্ষিত বন গঠন করা হয়। ১৮৮৫ সালে সর্বমোট বনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৩৪৫ বর্গমাইল। এর পর সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে বন ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে।

পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে ১৯৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য জনাব জহির উদ্দিন এর কার্যকরী পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য এবং এর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১। পার্বত্য চট্টগ্রামের দূর্গম অববাহিকা অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণ বনের আচ্ছাদন সৃষ্টি করা।
২। পাহাড়ের অনাবৃতকরণ রোধ করত: ভূমি ক্ষয় রোধ এবং পলি জমার কারণে নদীভরাট রোধ করা।
৩। স্থানীয় (আদিবাসী) জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
৪। আশে পাশের জেলা সমূহে স্বল্পমূল্যে বনজদ্রব্য সরবরাহ করা।

১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৮৮-৮৯ সালে প্রণীত হয় মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী পরিকল্পনা। তাতেও পূর্বের ন্যায় উদ্দেশ্যসমূহ অপরিবর্তিত থাকে। তবে এই পরিকল্পনায় স্থানীয় আদিবাসীদের বনজদ্রব্যের চাহিদানুযায়ী সরবরাহ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এছাড়াও বনায়নের মাধ্যমে অসমভাবাপন্ন (Irregular) সমভাবাপন্ন (Uniform) অধিক মূল্যবান বৃক্ষের বন সৃজনের পরিকল্পনাও এতে স্থান পায়। ১৯৯০ সালে সরকারী বনের গাছ কর্তন বন্ধ হওয়ার পর বর্তমানে আর কোন কার্যকরী পরিকল্পনা চালু করা হয়নি। পাকিস্তান সরকার ১৯৬১ সালে জুম চাষ নিয়ন্ত্রন, ভূমিহীন প্রজা ও জুমিয়া পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন, ভূমি ক্ষয় রোধ ও ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বনজ সম্পদের উন্নতির লক্ষ্যে জুম নিয়ন্ত্রন বিভাগ

চালু করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অশ্রেণীভূক্ত বনাঞ্চলে বনানীকরণ ও জুমিয়া পরিবার পূর্ণবাসন প্রকল্পের আওতায় কিছু সংখ্যক জুমিয়া পরিবারের পূর্ণবাসনের কাজ হাতে নিলেও পরবর্তীতে এ উদ্যোগ অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮১ সালে কাপ্তাই ও বান্দরবানে পাল্পউড বাগান সৃষ্টি করা হয় মূলত: কর্ণফুলি কাগজ কলের নরম কাঠ সরবরাহ করার প্রয়োজনে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বনের বিস্তৃতি ও পরিচিতি:

১। *কাজলং (কাচালং) সংরক্ষিত বন* এলাকা পুরাতন কাজলং এবং মেয়নী নদীর অববাহিকা জুড়ে কাজলং সংরক্ষিত বনের অবস্থান। যা পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্ববৃহৎ সংরক্ষিত বন। কাজলং নদীর উপর দিকের শাখা সমূহের অববাহিকা জুড়ে পুরাতন কাজলং সংরক্ষিত বনের বিস্তৃতি। এই নদীর প্রধান দুই উপনদী শিজগ ও গঙ্গারাম, কাজলং সংরক্ষিত বনের দক্ষিনাংশ এবং মেয়নী সংরক্ষিত বন কাপ্তাই বাঁধের কারণে ডুবে গেছে। এই সংরক্ষিত বনের বিরাট অংশ কাপ্তাই হ্রদ সৃষ্টির কারণে ধ্বংস হয়ে যায়।

২। *রেঙখ্যং (রাইংখিয়ং) সংরক্ষিত বন:* এই সংরক্ষিত বন রেঙখ্যংনদীর উপরের দিকে উপত্যকা ফারুয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ বন। রেঙখ্যং উপত্যকা বেশ দীর্ঘ এবং দক্ষিণাশের । ক্রমশ সংকুচিত হয়ে গেছে ঠেগা দীর বাম তীর সুবলং অববাহিকতা ও এই সংরক্ষিত বনের অংশ রেঙখ্যং সংরক্ষিত বন পূর্ব ও উওর সাইচল শেষ সীমান্তর্বতী খাড়া প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত। ঠেগা নদীর বরাবর এই বনের পূর্ব প্রান্তে ভারতের আর্ন্তজাতিক সীমারেখা এবং ওপারে মিজোরাম দেমাগ্রীর সুউচ্চ পাহাড় । এই বনের দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে মায়ানমারের আরাকান প্রদেশ ।

৩। *কাপ্তাই সংরক্ষিত বন:* কাপ্তাই সংরক্ষিত বন প্রচীনতম সেগুন বাগানের জন্য প্রসিদ্ধ। কাপ্তাই জল বিদুৎ প্রকল্প স্থাপনের পর এই বনের প্রধান এবং গুরত্বপূর্ণ অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমানে এই বন কাপ্তাই বাঁধের নিচে যৎসামান্য সেগুন গাছ ছাড়া আর কোথাও কোন কিছু অবশিষ্ট নেই।

৪। *শঙ্গ (সাংগু) সংরক্ষিত বন:* শঙ্গ সংরক্ষিত বন বান্দরবন জেলায় অবস্থিত । এই বন অত্যন্ত দুর্গম, বর্তমানে ইহা চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধীন বান্দরবন বন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ।

৫। মাদামবড়ী মোতামুহুরী সংরক্ষিত বন ঃ-চট্টগ্রাম বনাঞ্চলের অধীন লামা বন বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনে রয়েছে এই বন । সংরক্ষিত বন আলীকদম থেকে শুরু হয়ে পূর্ব দিকে বার্মা সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বন ভুমির পরিমাণ:

দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ৪০%শতাংশই পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত। এই অঞ্চলে ২৬,৮৬,০০০.০০ একর বন বিদ্যমান এর মধ্যে ৭,৯৯,৫৫.০০ একর সংরক্ষিত বন, ৩২,২৫০.০০ একর রক্ষিত বন এবং ১৮,৪৫,২০০.০০ একর অশ্রেণীভুক্ত বণাঞ্চল। পক্ষান্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ভূমির (৩১,৫৭,৬৬০.০০ একর) ৮৫%শতাংশ বনভুমি। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমির ২২°- ০ উত্তর থেকে ২৪°-০ উত্তরে অক্ষাংশের ভিতর এবং ৯২°-০ পূর্ব থেকে ৯৩° - ০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। বিজ্ঞানীদের নিকট এ এলাকার বন উষ্ণ মন্ডলীয় মিশ্র চিরহরিৎ বন হিসেবে পরিচিত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বনের শ্রেণী বিভাগ ঃ

১। চিরহরিৎ বন (Evergreen Forest)

ক) উষ্ণমন্ডলীয় আদ্র চিরহরিৎ (Tropical wet evergreen Forest)

খ) উষ্ণমন্ডলীয় মিশ্র চিরহরিৎ বন (Tropical mixed evergreen Forest)

গ) পাত্র মোচীবন (Deciduou Forest)

ঘ) উষ্ণমন্ডলীয় আদ্রপত্র মোচী নদীতীর বন (Tropica moist deciduou reverie Forest)

ঙ) উন্মুক্ত পত্রমোচীবন (Open deciduou Forest)

চ) বাঁশবন (Bamboo brakes)

ছ) শনখোল ও খাগড়ার জঙ্গল (Savannah Forest)

প্রিয় পাঠক, উপরোক্ত দীর্ঘ বর্ণনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে বিস্তৃত বনভূমির বিশদ বিরবন দেয়া হলো। হয়তো বড্ড মূল ধারণা হবে যে, এসব সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সারি সারি বৃক্ষরাজি রয়েছে। কাপ্তাই বাঁধ দেয়ার সময় নদীপথে যোগাযোগ সুবিধার জন্য ব্যাপকহারে বন-সম্পদ নিধন করা হয়। বনের মূল্যবান গাছ সমূহ চলে লুটোপুটি আহরণ। এশিয়ার বৃহত্তম পেপার মিল কর্ণফুলী পেপার মিলে কাগজ তৈরী করতে কাঁচামাল হিসেবে প্রতিদিন লাগে হাজার হাজার মে. টন বাঁশ ও নানা প্রজাতির নরম জাতীয় গাছ। ১৯৮০-

৮১সালে বহিরাগত বাঙালী সেটেলার প্রবেশের ফলে পাহাড়ীরা নতুন আশ্রয়ের জন্য ঠাঁই নিতে বাধ্য হয় গভীর বন-বনান্তরে। আর বন সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত এক শ্রেণীর অসাধু সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগসাজশে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের সমতল জেলা হতে আগমন ঘটে কাঠ ব্যবসায়ী নামক হাজার হাজার বন সম্পদ লুটপাটকারীর। দিন রাত হাজার হাজার কাঠভর্তি ট্রাক যাচ্ছে সমতল ভূমি জেলাগুলোতে। সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে জুড়ে স্থাপন করা হয়েছে কয়েকহাজার স'মিলস্ আর লক্ষাধিক কাঠের দোকান। এসব কাঠের দোকানে দিন রাত বানানো হচ্ছে নানা ধরণের বাহ-ারী আসবাবপত্র। আসাবাবপত্রগুলো সোনার দামে বিক্রয় করে দেয়া হয় সমতল জেলাগুলোতে। এ অঞ্চলের বনজ সম্পদে টাকার পাহাড় গড়েছে সমতলের ব্যবসায়ীরা আর আদিবাসী মানুষ পরিণত হয়েছে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের কাঠুরিয়া হিসেবে। এভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল্যবান বনজ সম্পদ। বর্তমান পাহাড়ে আর সেই আগের দিনের বন জঙ্গল নেই। আর নেই সেই বুনো ময়ূর, গন্ডার, গয়াল, বুনো ছাগল, হরিণ, বাঘ ইত্যাদি। বন সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্বে একশ্রেণীর নিয়জিত অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীরা হলো বনজ সম্পদ ধ্বংসের জন্য এক মাত্র দায়ী। যারা বনজ সম্পদ রক্ষক তাঁরাইতো এখন ভক্ষক। কি আজব কান্ড পার্বত্য কান্ড পার্বত্য চট্টগ্রামে! অপর পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ ধ্বংসের জন্য বন বিভাগ দায়ী করেছে পাহাড়ী আদিবাসীদের। তাঁদের অভিযোগ জুম চাষের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিরানভূমি হয়ে যাচ্ছে। এ যুক্তি সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন যা নিজের দোষকে ধামাচাপা দেওয়ার অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে চলতে তাকলে সারা পার্বত্য চট্টগ্রাম ধূঁ-ধূঁ মরুভূমি হয়ে যাবে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মানব বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে পার্বত্য চট্টগ্রাম। অতিরিক্ত গাছ কর্তনের ফলে পাহাড়ী ঝিড়ি ঝর্ণাগুলিতে আর পানীয় পানি পাওয়া যায় না। অথচ কি অর্পূব উৎপাদনের সম্ভাবনাময় ছিল এসব পাহাড়ী ঝর্ণাগুলি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বনভূমি উন্নয়ন সংরক্ষণের জন্য আরো নতুন করে ভাবতে হবে। বাঁচতে হবে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের আর সে জন্য বাঁচতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল ও পরিবেশকে। গাছ আহরণের তথাকথিত ফ্রি পারমিট ও আসবাবপএ পরিবহনের পারমিট বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে কারণ এসব পারমিটগুলোর আড়ালে উজার হয়ে যাচ্ছে এ অঞ্চলের বনভূমি। নির্ধারিত সময়সীমা নিয়ে গাছ কাটা বেঁচা-বিক্রি বন্ধ করা দরকার। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠা সু'মিল, আসবাবপএ দোকানগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ

নিতে হবে । আর এজন্য দরকার সমন্বিত রাজনৈতিক প্রচেষ্টা। নচেৎ এ অঞ্চলের বন, পাহাড়-ঝিড়ি ঝর্ণা পরিবেশ কিছুই রক্ষা করা যাবে না। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে পাহাড় এখন উলঙ্গ মরুভুমি প্রায়। অতএব, সময় থাকতে সাবধান, পরবর্তীতে যেন বনভূমির জন্য কারোর কপাল চাপড়াতে না হয়।

তথ্য সূত্র:

১। সুপ্রিয়তালুকদার, চম্পক নগরের সন্ধানে ও বির্বতনে চাকমা জাতি, উসাই রাঙামাটি।

২। সুগম চাকমা, অখ্যইক, বিজু সাময়িকী, ২০০৪ খ্রিঃ,

৩। জনাব আর, কে মজুমদার, বৃক্ষমেলা স্মরণিকা ২০০০খ্রিঃ, রাঙামাটি।

লেখক ও সমাজকর্মী

আরো একটি আদিবাসী দশক; প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সোহেল চন্দ্র হাজং

৯ আগষ্ট, ২০০৪ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালনের মাধ্যমে শেষ হলো জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত প্রথম আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক (১৯৯৫-২০০৪)। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও পালন করা হয় এ দিবসটি। "আমাদের ভূমি আমাদের জীবন" এ ছিল বাংলাদেশের প্রথম আন্ত র্জাতিক আদিবাসী দশকের শেষ বর্ষের শ্লোগান। যে আশা ও উদ্দেশ্য নিয়ে আদিবাসী দশক তার পথযাত্রা শুরু করেছিল, দীর্ঘ দশটি বছর আন্দোলনের পর তার কতটুকু বাস্তবায়িত হলো বা আদিবাসীরা কি অর্জন করতে পারলেন এ দশটি বছরে সেটিই যেন মেপে দেখার বিষয়। বিশ্বের প্রায় ৩০ কোটি আদিবাসীর রাজনৈতিক অধিকার, স্ব-শাসন, ভাষা, ভূমি, অর্থনীতি, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সংস্কৃতি ও সর্বোপরি মানবাধিকারের ক্ষেত্রসমূহে কতুটুকু বাস্ত বতার রূপ দেখেছে বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রগতি কতটুকু হলো, প্রথম আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের শেষে এই ভাবনা গুলো ভাবায় সকল আদিবাসীদের—। প্রথম আর্ন্তজাতিক আদিবাসী দশক যে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়নি বা আদিবাসীদের প্রতিকূল অবস্থার উন্নয়ন ঘটেনি তার প্রমাণ জাতিসংঘ কর্তৃক আরো একটি আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক (২০০৫-২০১৪) ঘোষণা। আজো বিশ্বের আদিবাসীরা কাটিয়ে ওঠতে পারেনি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হতে, আদিবাসীদের পূর্বাহিতকরণ সম্পদ আহরণ, জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণ, পার্ক ও সংরক্ষিত অঞ্চল ঘোষণা, সামরিকীকরণ, বহিরাগত বসতি স্থাপন ইত্যাদি স্বার্থবিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ফলে আদিবাসীদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা চরমভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং চিরাচরিত ভূমি থেকে তারা চিরতরে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। এশিয়ার আদিবাসীরা চরম নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে ব্যাপক সামরিকীকরণ এবং নৃশংস সেনা শাসন জারির ফলে। মিয়ানমারে, 'ব্ল্যাক এরিয়া' ঘোষণা ও দেখামাত্র গুলি, জাপানের 'মার্কিন সামরিক ঘাঁটি' ইন্দোনেশিয়ায় ডরাবত সিপিল এ্যন্ড ডরাবন্ত মিলিটারী এবং থাইল্যন্ড, ফিলিপাইন ও নেপালে ব্যাপক সেনা অভিযান ইত্যাদি অব্যাহত। প্রথম মান্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের ব্যর্থতার কথাই বলে।

আমাদের এ ১৪ কোটি মানুষের-আবাসভূমি বাংলাদেশের কথা ধরা যাক। যেখানে প্রায়—ছোট বড় ৪৫ টি জাতিস্বত্তা মিলিয়ে প্রায় পঁচিশ লক্ষাধিক আদিবাসী বাস করছে। যারা সংখ্যায় এত কম যে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মাঝে খুঁজে মেলা ভার। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের চাপে সংখ্যাগুরুরা কখনও অস্বীকার করতে পারবে না যে এদেশে কোন আদিবাসীদের অস্তিত্ব নেই। কারণ আমরা যে আদিবাসী এটা কখনও মুখে বলে প্রমাণ করতে হয়না যে আমরা আদিবাসী। হাজারো বাঙ্গালির ভীরে সহজেই খুঁজে নেওয়া যায় আদিবাসীদের। মুসলিম ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত বাঙালি সংখ্যা গরিষ্ঠের এদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের চিহ্নিত করতে হয় তাদের নাম ও টাইটেল শুনে। সেখানে আদিবাসীদের দৈহিক কাঠামো ও সংস্কৃতি দেখে বাঙালিদের অসুবিধা হয় না এ ক্ষুদ্র জাতিসত্তা গুলোকে চিনে নিতে। কিন্তু দেশের উন্নয়নের বড় বড় উদ্যোগ নেওয়ার সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় পরিচালকদের কখনো মনে থাকে না এ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কথা। বরং সবলদের দ্বারা দুর্বলরা নির্যাতিত হয়ে আসবে এবং এখনো হচ্ছে এটাই স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। আদিবাসীদের ধ্বংস করে কাপ্তাই হ্রদ তৈরি এবং ইকো পার্ক তৈরি, জুম্ম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে বাঙালিদের বসবাসের অনুমতি, তাদের জন্য গুচ্ছ গ্রাম তৈরি এ যেন বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জলাঞ্জলি। বলতে পারেন প্রথম আর্ন্তজাতিক আদিবাসী দশকে বাংলাদেশের আদিবাসীদের সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল "পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭"। এ চুক্তিটি হওয়ার ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে বড় সুনাম অর্জন করেছিল এ রাষ্ট্রটি। বড় স্বপ্ন ও আশা জাগিয়েছিল এদেশের আদিবাসীদের মনে। কিন্তু শান্তি চুক্তির সাড়ে সাতবছর পর আজ এ চুক্তিটিই যেন আরেকটি স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। প্রথম স্বপ্ন ও দ্বিতীয় স্বপ্নের মাঝে তফাৎটি হলো প্রথমটি বাঁচার সাধে পরিপূর্ণ, দ্বিতীয়টি আলেয়ার পাত্র, যা ধরা না দিয়ে বরং আরো কাঁদিয়ে গেলেন। চুক্তি যখন বাস্তবে পরিণত না হয় তখন চুক্তি শব্দটি ব্যবহার করার যৌক্তিকতা ও যেন হারিয়ে ফেলে। তার উপর শান্তি শব্দটি যুক্ত থাকলে বাহুল্য ও হাস্যকর কিছু মনে হয় আদিবাসীদের কাছে।

গারো পাহাড় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বা বরেন্দ্রভূমি থেকে খাসিয়া পাহাড় কোথাও নিরাপত্তায় নেই বাংলাদেশের আদিবাসীরা। অথচ এদেশটি গড়ার পেছনে "স্বাধীনতা যুদ্ধে" ভূমিকাতো কম ছিল না এদেশের আদিবাসীদের। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি আপামর জনতার পাশাপাশি অংশ নিয়েছিলেন পূর্ব বাংলার বিভিন্ন আদিবাসী জাতি। তাদের মধ্যে অনেকেই জীবন দান করেছেন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। লাখ লাখ আদিবাসী ঘরবাড়ি, সহায় সম্বল হারিয়েছেন এ দেশটির

জন্যই। কিন্তু নিজের হাতে গড়া এ নিজ ভূমিতে পরবাসী হয়ে থাকতে হবে আদিবাসীদের, এ চিন্তা তারা কখনো করেনি। তারা এটাও কখনো কল্পনা করেনি যে তাদের নির্যাতন, নিপীড়ন, ভূমি দখল, উচ্ছেদ ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু আদিবাসীরা এটুকু অনুধাবন করতে পেরেছেন যে আন্দোলন বা সংগ্রাম ছাড়া তাদের অধিকার ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাই আদিবাসীরা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় ও সকল প্রকার নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে আসছে যুগ যুগ ধরে। প্রয়োজন পড়ছে বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালনের। একটি আদিবাসী দশক শেষ হয়ে শুরু হচ্ছে আরেকটি আদিবাসী দশক।

আর যাই হোক প্রথম আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক এদেশের আদিবাসীদের (প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত) আন্দোলন, নিজেদের সমস্যা ও অধিকার সম্পর্কে আরো সচেতনতা সৃষ্টি করেছিল এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই ৯ আগষ্ট এলে অন্তত আদিবাসীরা তাদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচার, নিপীড়ন ও দুঃশাসনের কথা তুলে ধরতে পারেন রাষ্ট্রীয় মহলে। রাষ্ট্র পরিচালকগণ তাতে দৃষ্টি দিক আর না দিক আদিবাসীদের দাবিগুলো যে বাস্ত বায়নযোগ্য দেশের সচেতন মহল এটি সহজেই বুঝতে পারেন। আদিবাসীরা একদিন সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাবে, তাদের নিজস্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে, ঐতিহ্যগত-ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি পাবে আদিবাসীদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা বন্ধ হবে, সেনা-শাসন বন্ধ হবে, আদিবাসী নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় আর ভূগবে না, আদিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে না, বাঁধ, ন্যাশনাল পার্ক ও ইকো পার্কসহ সমস্ত-পদক্ষেপ বন্ধ হবে যা আদিবাসীদের জীবনে আঘাত হানে বা বিপর্যস্ত করে এ ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে। প্রথম আর্ন্তজাতিক আদিবাসী দশকে যা বাস্তবায়িত হয়নি তা হয়তো ২য় আন্ত র্জাতিক আদিবাসী দশকে বাস্তবায়িত হবে এ প্রত্যাশা সকল আদিবাসীর। স্বপ্ন দেখতে দেখতে আজ আদিবাসীদের কল্পলোকে হাবুডুবু খাওয়ার মত অবস্থা, তবু তারা হাল ছাড়বেনা আশা রাখবে, সংগ্রাম করবে, নিজস্ব আত্মনিয়ন্ত্রন অধিকার ফিরিয়ে আনবে। সকল সমস্যার একদিন সমাধান হবে, জানিনা সেদিন কবে আসবে; আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের জন্য আর অপেক্ষা করতে হবে না কোন আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক ঘোষণার। কিংবা বাংলাদেশের আদিবাসীদের সমস্যার কোন উচ্চারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না কোন "আদিবাসী দিবসে"।

ছাত্র, সমাজকল্যাণ বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তন্‌চংগ্যা জাতি আমার গর্ব ; ধর্ম আমার সার্থকতা

কাজল তন্‌চংগ্যা

কবি নই তবুও কখনো কখনো কবি হয়ে যাই, লেখক নই তবুও কখনো কখনো লেখক হয়ে যাই। জীবনে কখনো লিখিনি কোন পত্রিকায় কিংবা ম্যাগাজিনে তবুও লিখতে হয়েছে পরীক্ষার খাতায়। আজ কি সৌভাগ্য আমার পরীক্ষার বাইরে জীবনে প্রথম লেখাটি লিখছি আমার গৌরবময় ঐতিহ্য তন্‌চংগ্যা জাতির এক গৌরবময় সংকলন "তৈন্‌-গাঙ" এর পাতায় , আমি মনে করি যারা কোন জাতি,ধর্ম, বর্ণ, গোত্র কিংবা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখা লিখি করে তারা অন্তত আমার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান ও গুনের অধিকারী এবং আমার এই গৌরবময় তন্‌চংগ্যা জাতির মধ্যেও সেই রকম অনেক গুণওান, জ্ঞানবান ব্যক্তিত্ব বা রত্ন আছেন যাদের মধ্যেমে আমাদের তন্‌চংগ্যা জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ধিকে ধিকে ফুটে উঠেছে। কিন্তু আমি এখনো বুঝে উঠতে পারছিনা অতি নগন্য একজন ব্যক্তি হয়ে আমাদের এই বিশাল গৌরবময় তন্‌চংগ্যা জাতি এবং সদ্ধর্ম বা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সর্ম্পকে কি ভাবে লিখব? তবুও আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে কিছু একটা লেখার প্রয়োজন মনে করছি।

প্রসঙ্গতঃ প্রথম থেকেই তন্‌চংগ্যা জাতিকে গৌরবময় লিখছি এজন্য হয়তো অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে আমরা তন্‌চংগ্যা জাতি এখানে আবার বিশাল কিংবা গৌরবের কি আছে? আসলে এখানে আমি নিজের মানসিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছি। আমাদের তন্‌চংগ্যা জাতিটিকে কে কিভাবে নেয় বা গ্রহন করে জানি না। তবে আমি নিজেকে যতই তন্‌চংগ্যা ভাবি ততই গর্ববোধ করি। কারণ আমার দৃষ্টিতে শুধু বাংলাদেশই নয় সমগ্র পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন জাতির চেয়ে আমাদের তন্‌চংগ্যা জাতির আচরনে, ব্যবহারে, ভাষায়, সংস্কৃতিতে আলাদা একটা সরলতার সন্ধান পাই। শুধু এই সরলতার কারনেই হয়তো বা আমরা অন্যান্য অনেক জাতির চেয়ে অনগ্রসর হয়ে পড়ে আছি। কিংবা এই সরলতাকে বুঝতে পেরেই অন্যান্য অনেক জাতি আমাদেরকে নিজের অজান্তেই আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য বা অগ্রসরতা থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। আমরা প্রেম-জিদ-রাগ-অহংকার-দায়িত্ববোধ-মনুষ্যত্ব-তৃষ্ণা যা কিছু বলি না কেন একটা কথা সত্য তা হল আমরা নিজের

অজান্তেই নিজের অস্তিত্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। তবে হ্যাঁ সবকিছুর মূলে অবস্থান করছে আমাদের সরলতা । আর এই সরলতার শ্রেষ্ঠ জাতি বলে বারবার নিজের জাতিকে নিয়ে গর্ববোধ করি। আর বিশাল বলে লিখেছি এই জন্য কারণ আমি একজন সাধারন ব্যক্তি হিসেবে অন্য একজন সাধারন ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা বা সমালোচনা করতে পারি কিন্তু পুরো একটা জাতি নিয়ে আলোচনা বা সমালোচনা করা আমার জন্য একটা বিশাল ব্যাপার নয় কি? থাক এ ব্যাপারে আর লিখছি না। এবার আসা যাক ধর্মীয় প্রসঙ্গে; প্রথমে তো সরলতার শ্রেষ্ঠ জাতি হয়ে জন্ম নিয়েছি তার সঙ্গে পেয়েছি জগতের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ যে ধর্মের প্রবক্তার উপাধির নাম শুনলে লক্ষ কোটি প্রানে শ্রদ্ধার উন্মেষ ঘটে, তা হল বুদ্ধ। বুদ্ধ ধর্ম সংঘ এই ত্রিরত্নের নাম স্মরণ করলে যে কোন আপদ-বিপদ কিংবা দুঃখ হতে নিমেষেই মুক্ত হওয়া যায়। কি বিশাল! কি মহান! কি অনন্ত গুণের অধিকারী এই নাম! সুপ্রিয় পাঠক সমাজ এর চেয়ে বেশী কিছু কি আর পাওয়ার থাকতে পারে। হ্যাঁ অবশ্যই আছে আর তা হল এই নামের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে শ্রেষ্ঠ সুখ অর্জন করা, যা একমাত্র নির্বাণ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।এখানে প্রথম দুটো শ্রেষ্ঠত্ব অবাঞ্ছনীয়, হ্যাঁ অবাঞ্ছনীয়ই বটে, তবে অব্যশই অর্জন যোগ্য,কারণ বুদ্ধের বাণী অনুসারে ৮ টি অক্ষন বিনির্মুক্ত হয়ে দুর্লভ বুদ্ধত্বকালে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করেছি দুর্লভ বৌদ্ধ পরিবারে, এটা কি পরিমাপ করা যায়? কত জন্ম জন্মান্তরের সাধনার ফল আজকের এই মহান প্রাপ্তি। কাজেই এখন কি আর ঘুমিয়ে থাকার সময় আছে? আসুন আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে জাগ্রত হই। এটাই শ্রেষ্ঠ সুখ লাভের শ্রেষ্ঠ সময়। কারণ শ্রেষ্ঠত্ব কেউ কাউকে এনে দিবে না, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব নিজেকেই অর্জন করে নিতে হবে। শ্রেষ্ঠত্ব বলতে আমি অন্যান্য শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলছি না আমি বলছি পরম সুখের শ্রেষ্ঠত্বের কথা। কারণ আমরা ধর্মের বাইরেও যে কোন দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারি। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠত্ব চিরস্থায়ী থাকবে না, চিরসুখী করতে পারবে না, বারবার দুঃখের সাগরে পড়তে হবে। আচ্ছা জগতে এখন কেউ কি আছে যে জীবনে সুখ চায় না? এখন প্রশ্ন হলো এমন একটা জাতিগত ঐতিহ্যের প্রসঙ্গে ধর্মীয় বিষয়টা সংযুক্ত করা কি যুক্তিসঙ্গত হল? ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা কিংবা দিক নির্দেশনা দেবার জন্য তো আমাদের ধর্মীয় গুরুরাই আছেন, তবে আমি কেন অনধিকারে চর্চা করে যাচ্ছি? আসলে প্রকৃত পক্ষে কেবল প্রকৃত লেখকরাই যে কোন বিষয়ে তাদের উপলব্ধ জ্ঞানকে সর্বসাধারনের মাঝে উপস্থাপন করতে, কিন্তু আমিতো সে রকম কিছুই নই, কিছু একটা লিখতে হবে তাই আমি চেষ্টা করছি আমার সাধারণ মনোভাবটাকে

অন্যান্যদের সাথে শেয়ার করতে, কারণ আমি মনে করি বৌদ্ধ ধর্ম এমন একটা শক্তিশালী ধর্ম যে ধর্মের প্রকৃত আলো একবার যদি কারো প্রানে জ্বলে উঠে তাহলে সেই আলো দিয়ে জগতের সকল অন্ধকার দূর করা যায়। সকল প্রকার শত্রু, আপদ-বিপদ, অসভ্য প্রভাব থেকে চিরতরে মুক্ত হওয়া যায় আর এই আলোটাকে জ্বালানোর জন্য শ্রদ্ধার সহিত মাত্র তিনটা উপদানের প্রয়োজন হয়। তা হল—(১) দান (২) শীল (৩) ভাবনা।

আমার স্ব-গৌরবে গৌরবান্বিত তন্‌চংগ্যা আীদবাসীদের প্রতি উদ্বাত্ত আহবান জানাই, আসুন আমরা প্রত্যেকেই স্ব-পরিবারে নিত্য দিনের কর্মের পাশাপাশি শ্রদ্ধার সহিত দানশীল ভাবনা করে যাই তার পর দেখি আমাদের স্বপ্ন আমাদের চাওয়াগুলো কি করে খুব সহজেই রূপান্তরিত হয়। আমার দৃষ্টিতে নিত্যদিনের কর্মের পাশাপাশি ধর্মকে বাধ্যতামূলক কর্ম হিসেবে প্রাধান্য দেয়া উচিত। তবেই মানব জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারবো। কারণ চিরন্ত ন সত্য কে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই, জগতে জন্ম নিয়েছি, কাজ করি বা না করি, খাই বা না খাই, মৃত্য সবার জন্য অবধারিত সত্য।

আমার জীবনে এই প্রথম অনভিজ্ঞ লেখায় ভুল অব্যশই থাকতে পারে সে জন্য সুপ্রিয় পাঠক সমাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমার এই লেখা যদি কারো বিন্দুমাত্র উপকারে আসে তাহলে আমার লেখা সার্থক মনে করবো, আর যদি নিজের অজান্তে কারো মনে দূঃখ দিয়ে থাকি সে জন্য আমি আন্তরিক ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি । জগতের সকল প্রানী সুখী হোক দূঃখ থেকে মুক্ত হোক, আমার গৌরবময় তন্‌চংগ্যা জাতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, বৌদ্ধ শাসনে যুগে যুগে কালে কালে তন্‌চংগ্যা জাতির অবদান অক্ষয় থাকুক, তৈনগাঙ লেখা সার্থক হোক, ভগবান সকলের প্রতি সহায় হোন ,এই আন্তরিক প্রত্যাশায়।

সমাজকর্মী

আদিবাসীর পোষাক স্বজাতি ঐতিহ্যের বাহন

অছ্য কুমার তনচংগ্যা সজিব

বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসত্ত্বার বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, নানাবিধ প্রথা এদেশের সাংস্কৃতিক জগতকে করেছে সমৃদ্ধ। মোট ৪৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেশের দক্ষিণ পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে ১৩টি এবং উত্তরাঞ্চল জুড়ে উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকা সহ রয়েছে প্রায় ৩২টি স্বতন্ত্রবৈশিষ্ট্য মণ্ডিত জাতিস্বত্ত্বার আদিবাসী। সম্পূর্ণ নিজস্ব স্টাইলে গড়ে উঠা দেশের নানা প্রান্তে অবস্থানরত এসব নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবন পদ্ধতি বড় বৈচিত্র্যময়। এদের ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, বিশ্বাস, প্রথা, আচার-ব্যবহার, চিন্তা-চেতনা নানাবিধ উৎসব নিঃসন্দেহে এদেশের গর্ব।
উল্লেখ্য যে, এসব স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর জীবন-বিধান হাজার বৈচিত্র্যর মধ্যে তার কিছু প্রতিফলন ঘটে তাদের নিজস্ব স্টাইলে বানানো ও ব্যবহার্য কাপড়-চোপড় এবং পোষাক পরিচ্ছদের উপর।

যদিও মানুষ সর্ব প্রথম কখন কোথায় কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তার কোন সঠিক স্পষ্ট ইতিহাস নৃ-বিজ্ঞানীদের এখনো জানা নেই তবুও অস্বীকার করার জোঁ নেই, মানুষ বহু বছর পর্যন্ত তার কোন পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল না। ইতিহাস পড়ে জানতে পারি, প্রাচীন কালে মানুষ বন্যজীবন আচরণ করত। আবরণের প্রতি তাদের কোন আলাদা লজ্জা বা সংকোচের মানসিকতা ছিল না। তারা বরং এটির প্রতি অভ্যস্থ হয়ে উঠে ঝড়-বৃষ্টি, রোদ-শীত ও পোকা-মাকড়ের কামড়ের যন্ত্রনা থেকে রেয়াই পাওয়ার জন্য। তারা গাছের ছাল, লতা-পাতা পশুর চামড়া ইত্যাদি ব্যবহার করত। এভাবেই অভ্যস্থ হয়ে এবং এর উপকারিতা উপলব্ধি করে তারা ধীরে ধীরে এর উন্নতি ও ব্যবহার সাধনে সচেষ্ট হয়। অতএব দেখা যায়-সৃষ্টির আদিতে সব পোষাক এক ও অভিন্ন। পরবর্তীতে ভৌগোলিক স্থান, কাল, আবহাওয়া, পরিবেশ-প্রকৃতি ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে এর স্বকীয়তার প্রকাশ পায়, এবং আজ অবধি এটি বজায় রয়েছে ।

বাংলাদেশে অবস্থানরত আদিবাসী জাতি সত্ত্বার মধ্যেও এই পোশাক-পরিচ্ছদ

বিকাশমান, এসব আদিবাসীর প্রায় প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব স্টাইল ও ঐতিহ্যেতে গড়া পোশাক বা ড্রেস। তবে এসব পোশাকের ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের প্রাধান্যই বেশী। এসব তৈরীর দায়িত্বও মেয়েদের উপর নির্ভর করে। ছেলেদের কাছে যা পুরোপুরি ফুটে উঠেনা, মেয়েদের ক্ষেত্রে তা স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠে। মেয়েদের পরনের পোষাক দেখলেই চেনা যায় যে সে কোন আদিবাসী বা জন গোষ্ঠীর, যদি তার জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সম্যক ধারণা বা পূর্ব পরিচিতি জান্য থাকে।

এই পোয়াক আবার ঋতুভেদে বিভিন্ন রকমও হতে পারে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং উপলক্ষ অনুসারেও রয়েছে এর ভিন্নতা। যেমন—বিয়ের পোষাক, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির পোষাক ইত্যাদি। আবার কোন ক্ষেত্রে মেয়েদের ড্রেস দেখলে বোঝা যায় যে সে বিবাহিত না অবিবাহিত অথবা বিধবা, এমনকি কোন অঞ্চলের। এর মধ্যে পরনের স্টাইলটাও বেশ গুরুত্ব বহন করে। যেমন—পোষাক এক হলেও বাংলাদেশী ও ভারতীয় বিমানবালাদের অথবা শ্রীলঙ্কানদের শাড়ী পরনের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। মোটামুটি সব কিছু মিলিয়ে এক একটি পোষাক এক একটি জাতি সত্ত্বার মডেল স্বরূপ। এর সবকিছুই তাৎপর্য বহন করে।

গ্রাম বাংলার নক্শী কাঁথার পেছনে যেমন লুকিয়ে আছে ইতিহাস। যেমন তাদের জীবনচিত্র, হাসি-কান্না, বিভিন্ন লোক কাহিনী বা ঘটনা প্রকাশ পায় নক্শী কাঁথার সূঁচের ফোঁড়ে, তেমনি আদিবাসীদের পোষাকের রং, ডিজাইন, নানা কারুকার্যের মাধ্যমে প্রতিটি সুতা বুননের পেছনেও ফুটে উঠে নানা ঐতিহ্যের প্রতিধ্বনি, অন্তরকথা, হারানো দিনের স্মৃতি। এসব আদিবাসীদের ঐতিহ্যের বহি:প্রকাশ। এর গুরুত্ব অনেক এবং এগুলোকে হেয় করে দেখার কোন অবকাশ নেই। কারণ এগুলো আমাদের অমূল্য সম্পদ, এক একটি জাতির ইতিহাসের সাক্ষী। এর মধ্যে আমাদের জীবন চিত্র মিশে আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আমরা ক'জনেই বা এর খেয়াল রাখছি। যে এতিহ্যের সাথে আমরা এক সময় জড়িত ছিলাম, আমরা হারাতে বসেছি সেই পুরনো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে। আমরা অনেকেই এখনো আমাদের পুরনো সেই আদি পোষাককে চিনিনা। কারণ, এগুলো প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। আজকাল কেবল প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে গেলে এগুলোর মূলরূপ কিছুটা দেখা মেলে। প্রত্যন্ত গ্রাম আর শহর মুখী গ্রামের পোয়াকের সাথে অনেক পার্থক্য

লক্ষ্য করা যায়। আমরা এখনো ভালোভাবে জানিনা আমাদের ইতিহাস, সাংস্কৃতিক জীবন-ধারাকে। যদিও এই পোষাক তার সাথে অনেকটা জড়িত। আমরা জানলেও ভুলে যাচ্ছি ভিন্ন অপ সংস্কৃতির আগ্রাসনে বা নিজেদের অবহেলায়। বিশেষ করে যারা শহরাঞ্চলে থাকেন তাদের মধ্যে এসবের তেমন একটা চর্চা হয় না। যান্ত্রিক পরিবেশের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে তারা নিজেদের সংস্কৃতিটাকেও ভূলে যায়। ক্রমেই অভ্যস্ত হয়ে উঠে অত্যাধুনিক ভিন্ন ফ্যাশনে। এভাবে এক সময় নিজেদের ড্রেস পড়তেও সংকোচ বা লজ্জা বোধ হয়। তারা অন্ধভাবে আঁকড়িয়ে ধরে ভিন্ন বেজাতীয় সংস্কৃতিকে। তারা তখন জ্যান্ত নগ্ন হয়ে যায় যে সংস্কৃতির পোষাককে ছাড়া তাদের কল্পনা করলে।

তাহলে আমরা কি অদূরেই হারিয়ে ফেলব আমাদের নিজস্ব পোষাক-পরিচ্ছদ? আমরা কি ভূলে যাব আমাদের অতীত উজ্জল ইতিহাস-ঐতিহ্য? হ্যাঁ, হয় তো তাই হবে যদি আমরা এভাবে অপরিকল্পিতভাবে তথাকথিত মডার্ন হয়ে উঠি। পরবর্তিতে আমাদের পোষাকের নমুনা দেখতে হলে যেতে হবে হয়তো কোন নৃতাত্ত্বিক যাদুঘরে। হয়তো সেখানেও পাওয়া যাবে না। আমরা তখন চিরদিনের মত হারিয়ে ফেলবো আমাদের লজ্জার আবরণকে।

কিন্তু না, আমরা এত সহজে হারাতে চাই না আমাদের ঐতিহ্যের বাহনকে। সভ্যতার এত উৎকর্ষ হয়েও আমরা আর পুরনো আদি বন্য জীবনে ফিরে যেতে চাই না। আমরা পরতে চাই না আবার সেই গাছের ছাল, লতা-পাতা, পশুর চামড়া। যে জীবন ছিল দুর্বিসহ, যাযাবর, অনিশ্চিত ও অবহেলিত । আমরা ফিরে যেতে চাই না প্রাগৈতিহাসিক সেই যুগে।
যেখানে ঐশ্বরিয়া রাইয়ের মতো নামী-দামী মডেল, বিশ্ব-সুন্দরী নায়িকাদের অস্কার পুরষ্কার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে দেখি নিজ দেশের ঐতিহ্যবাহী জাতীয় পোষাক শাড়ী পড়া অবস্থায়। যেখানে বিশ্বখ্যাত অলিম্পিক ও নানা বিশ্ব প্রতিনিধিত্বমূলক অনুষ্ঠানে পর্যন্ত অংশগ্রহণ করতে দেখি নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্যবাহী পোষাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় অন্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা অথিতিকে সম্মাননা বা গ্রহণ করা হয় সে দেশের রীতি-নীতি, পোষাক পরিচ্ছদের মাধ্যমে। তাহলে সে তুলনায় আমরা নিজের সংস্কৃতিকে চর্চা করতে পিছ পা হব কেন? সেই উদাহরণ থেকে আমরা কি কিছুই শিখতে পারি না ?

আমাদের আদিবাসী পোষাক সংস্কৃতির রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। ইতিমধ্যে আমাদের পোষাক জয় করেছে সংস্কৃতিমনা উৎসাহী মানুষের মন। এখন এগুলো শুধু আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আমরা এগুলো উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে নিজেদের দারিদ্রতাও দূর করতে পারি। কারণ এগুলোর চাহিদা রয়েছে এবং অন্যদের মাঝে দিন দিন গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে, বাড়ছে। এ ব্যাপারে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতারও দরকার রয়েছে এগুলোর শিল্প বাড়াতে হলে। তবে সবচেয়ে বেশী দরকার নিজেদের আত্ম মননশীলতা। আমরা প্রত্যেকেই অন্যদের শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে অন্যের সংস্কৃতিকেও শ্রদ্ধার সাথে বিবেচনা করে চর্চা করবো নিজ সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে। তবেই আমাদের ব্যক্তিক, সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব। আমরা প্রত্যেকেই জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দিতে পারবো নিজেদের পরিচয়। এগিয়ে যেতে পারবো আত্ম সম্মান নিয়ে। এ মুহূর্তে সেটাই সবার কাম্য।

ছাত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশ তন্‌চংগ্যা কল্যাণ সংস্থার করণীয় ও আগামী প্রজন্ম

আনন্দ তন্‌চংগ্যা (সুপন)

সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা আমাদের প্রিয় মাতৃভুমি বাংলাদেশ। উচু-নিচু সবুজ পাহাড়ে ঘেরা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা। এখানেই সহজ-সরল ১৩ টি ক্ষুদ্র পাহাড়ী জাতিসত্তার বসবাস। যেখানে ছিল না কোন হিংসার ছোঁয়া, ছিল শুধু সকল জাতিসত্ত্বার মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ, সোহার্দ ও সম্প্রীতির বন্ধন। বর্তমানে পাহাড়ের পাদদেশে প্রবাহিত হচ্ছে হিংসার ঝর্ণাধারা। তবুও ১৩ টি জাতিসত্ত্বার জনগণ একে ওপরের সাথে সুভাতৃত্ত্ব বজায় রেখে বসবাস করছে। এই ১৩ টি জাতিসত্ত্বার মাঝে তন্‌চংগ্যা একটি অন্যতম জাতি। তাদের কৃষ্টি, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যর মাধ্যমে পার্বত্য চট্রগ্রামে বসবাস করে আসছে। তাঁদের সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজারের মত।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে তন্‌চংগ্যা জনগোষ্ঠি অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। কি কৃষ্ঠি কি সংস্কৃতিক তথা-শিক্ষা-দীক্ষায়। নেই কোন আন্ত:সামাজিক সু-সম্পর্ক ও যোগাযোগ। অথচ আমাদের নিজস্ব কৃষ্ঠি রয়েছে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিবর্গ, সাহিত্যিক, লেখক সহ সচেতন যুব ও ছাত্র সমাজ রয়েছে। কি নেই আমাদের মাঝে সবিইতো আছে। শুধু একতা ও ঐক্য নেই। অন্যান্য জাতিসত্ত্বার দিকে তাকালে দেখা যায় তাদের সমাজের অবস্থান আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আমরা সকলে জানি ১৯৮৩ ইং সনে তন্‌চংগ্যা সমাজ কল্যাণ সংস্থা (তস্‌স) যা পরবর্তীতে অর্থাৎ সমাজ বাদ দিয়ে বাংলাদেশ যোগ করে ১৯৯৫ ইং সনে বাংলাদেশ তন্‌চংগ্যা কল্যাণ সংস্থা (বাতকস) রাখা হয়। এই সংস্থা তন্‌চংগ্যা জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়, জাতির ক্লান্তিলগ্নে এই সংস্থা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যার জন্য আমরা কৃতজ্ঞা প্রকাশ করছি। কিন্তু এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে সমাজের কাজে কতটুকু সুফল দিতে পেরেছে তা ভাবনার বিষয় রয়েছে। আসলে এই সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ? অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা, দীক্ষায়, সাহিত্য সংস্কৃতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নাকি শুধু নামের জন্য ?

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, এই সংস্থার স্থায়ী নিজস্ব কোন কার্যালয় নেই, কিন্তু সাইন বোর্ড রয়েছে। জানি না এটা কতটুকু সত্য। প্রতি বছরে জাঁকজমক বিসু উৎসব পালন করা হয়। বছরের বাকি সময় এই সংগঠনের কোন খোঁজ খবর থাকে না। উৎসবে যোগ দেওয়া জনগণের মধ্যে শতকরা পঁচিশ জন শিক্ষিত ও সচেতন ব্যাক্তি খোঁজ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ রয়েছে ! সর্বশেষ সরকারী জরীপের তথ্যানুযায়ী প্রায় ৫০ হাজারের মত তন্‌চংগ্যা জনসংখ্যা। এই জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে শিক্ষা তথা সব দিক দিয়ে পিছিয়ে রয়েছে।

এই সংস্থার নেতৃবৃন্দরা তা কিভাবে দেখছেন ? অধিকাংশ জনগোষ্ঠিকে অন্ধকারে রেখে কোন জাতি টিকে থাকতে পারে না। অথচ এই সংগঠন শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তব পদক্ষেপ এই যাবৎ নিয়েছে কি না, তা আমাদের জানা নেই। কয়েকটি গ্রামের কিছু লোক শিক্ষিত হলেই কি পুরো জাতিটিকে শিক্ষিত বলা যাবে ? অথচ তন্‌চংগ্যা সমাজে পণ্ডিত,জ্ঞানী ব্যাক্তি, সমাজ সেবক দিয়ে গঠন করা হয়েছে দক্ষ উপদেষ্টা মণ্ডলী এবং সমাজের শিক্ষিত, আদর্শবান ও শক্তিশালী তরুণদের নিয়ে কার্যকরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি আজও সমাজের উপকারে আসে এই ধরনের কোন প্রকার বাস্তব পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

জানি আমার এ লেখায় ভিন্ন মত সৃষ্টি হবে। এটা বাস্তব সত্য যে, অধিকাংশ গ্রামে হাজারো মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী-র পরিবারের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হওয়ার কারণে উচ্চ শিক্ষা বাদে প্রাথমিক শিক্ষা ও সম্ভব হচ্ছে না। অথচ এসব ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজ তথা জাতির জন্য বিরাট ভূমিকা রাখতে পারবে। আমার এই সত্যকে আড়াল করলে তন্‌চংগ্যা জনগোষ্ঠির আগামী প্রজন্ম সঠিক ভাবে এগিয়ে যেতে পারবেনা। এজন্য বর্তমান সমাজের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিবর্গ, সাহিত্যিক, গবেষক, লেখক তথা সচেতন সমাজকে এই ভুলের মাশুল একদিন অবশ্যই দিতে হবে। তাই আমার আলোচ্য বিষয়টুকু অন্য চোখে না দেখে ভুল ত্রুটি গুলো সঠিক ভাবে সংশোধন করে আগামীতে কি ভাবে আমরা সকলেই মিলে মিশে হাতে-হাত, কাঁদে-কাঁদ মিলিয়ে জাতির উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড হাতে নেওয়া যায় অর্থাৎ এই শোষিত জাতিকে কিভাবে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছানো যায়, সেই চিন্তা করতে হবে আপনাদের প্রজন্ম তাই প্রত্যাশা করে।

আমরা পাঠ্য বইতে পড়েছি দশের লাঠি একের বোঝা অর্থ্যাৎ এই প্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই ব্যক্তিগত ভাবে যতটুকু করা যায় না, তার চেয়ে সংগঠনের মাধ্যমে আরো বেশী কিছু করা সম্ভব। তাই আমাদের সবার জাতির স্বার্থে উদার মন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। বৃহত্তর তন্‌চংগ্যা জনগোষ্ঠির মাঝে শিক্ষার আলোর মশাল পৌঁছে দিতে একমাত্র বাংলাদেশ তন্‌চংগ্যা কল্যাণ সংস্থাই পারে। এই সংস্থার যোগ্য নেতৃত্বে ও সু-কর্ম প্রচেষ্টায় সমাজের প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করে একটি দক্ষ ছাত্র সংগঠন উপহার দিতে পারে। তাই সমাজের গুণীজন ও সচেতন ছাত্র/ছাত্রীদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

এ কথা সত্য যে আমাদের অধিকাংশের তন্‌চংগ্যা জনগোষ্টির অর্থনৈতিক অবস্থা দূর্বল বলে প্রতিটি কার্যক্ষেত্রে তারা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। তাই এ বাধা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, একটি সুন্দর, সুস্থ ও সুশীল সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন একটি দক্ষ ছাত্র সংগঠন। একটি সংগঠন একটি জাতির শক্তি। এ শক্তি সম্মিলিত জ্ঞানের শক্তি। এ জ্ঞানের প্রজ্বলনেই একটি জাতির বিকাশ ঘটে। যুগ যুগ ধরে প্রতিটি সম্প্রদায় কিংবা জাতি তাঁদের অধিকার ও নিস্পেষনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছে। সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক অগ্রগতির পথ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং পাশাপাশি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তার বিকাশ ঘটানো আর এজন্য নতুন চেতনায়, সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার ছাত্র সমাজের কথা সর্বজন স্বীকৃত। ছাত্র ব্যতীত কোন দেশ তথা জাতি টিকে থাকতে পারে না। বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত তন্‌চংগ্যা ছাত্র/ছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে। তা না হলে, এ অবস্থা চলতে থাকলে জাতি হিসাবে বেঁচে থাকা দায় হয়ে পড়বে। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা এমন কি উত্তর বঙ্গে গারো, সাওতাঁলরা ছাত্র সংগঠন করতে পারলে আমরা পারব না কেন ? কেন আমরা ঐক্যদ্ধ ভাবে সংগঠিত হতে পারছিনা ? আমাদের বাধা কোথায় ? এ ব্যাপারে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গকে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি সচেতন ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের জোর প্রচেষ্টা থাকতে হবে। তবেই আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য জাতিসত্বার মাঝে নিজস্ব ঐতিহ্য নিয়ে বেচেঁ থাকতে পারবো।

সংগঠন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ? প্রকৃত উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণ সাধন করা, সমাজের উপকার করা, সমাজকে দ্বিধা বিভক্ত করা নয়- একত্রিভূত করে, একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে ছাত্র/ছাত্রীদের যোগাযোগ স্থাপন করা। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তন্‌চংগ্যা কল্যাণ সংস্থাই পারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে। এই সংস্থার নেতৃবৃন্দরা তন্‌চংগ্যা জনগোষ্ঠির স্বার্থে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিতে পারে—

- ❑ অস্বচ্ছল মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের মেধার বিকাশে আর্থিক সহায়তা প্রদান পূর্বক সুশিক্ষিত যোগ্য নাগরিক গড়ার মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করা হবে।
- ❑ সমাজ উন্নয়নে বাস্তবধর্মী কর্মসূচী পণয়ন এবং সংগঠনের কার্যক্রমে সমতা ও জবাদিহিতা থাকতে হবে। তবেই জনগণের সুনাম অর্জনে সক্ষম হবে।
- ❑ এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী হাতে নিতে পারে।

আশা করি বৃহত্তর তন্‌চংগ্যা জনগোষ্ঠির সার্থে সমাজের সচেতন ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে আসবেন বলে।

ছাত্র, ঢাকা

জীবনীঃ রতিকান্ত তন্‌চংগ্যা (১৯৪১-)

চারুশিল্পের বিকাশমান ধারার বর্তমান প্রাণপুরুষ ধ্যানী-মৌনি শিল্পী রতিকান্ত তন্‌চংগ্যা পার্বত্য জনপদের আলোকিত এক নাম। তাঁর জন্ম ১৯৪১ ইংরেজি রাঙামাটি জেলার রাইংখিয়ং নদীর পশ্চিম তীরবর্তী (বর্তমান বিলাইছড়ি উপজেলা) ১২২ নং কুতুবদিয়া মৌজার বড়াদম গ্রামে। শিল্পীর শৈশব এখানেই কাটে। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে বান্দরবান জেলার বালাঘাটা নামক স্থানে পূনঃ বসতি স্থাপন হয়। এর কিছুদিন পরে সহধর্মিনী পরলোকগত হলে তার জীবনে নেমে আসে শোকের ছায়া। জীবিকার জন্য ১৯৬৯ সালের ১৪ই এপ্রিল কৃষি কর্পোরেশমনের অধীনে রাঙামাটিতে চাকরী শুরু করেন। চিত্রকলা আর চিত্রশিল্পী গড়ার প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকেই নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন পার্বত্য জনপদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান রাঙামাটি চারুকলা একাডেমী। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। এর পর থেকে একে একে তার জীবনে সাফল্যের অধ্যায় যোগ হতে থাকে।

শিল্পী রতিকান্ত তন্‌চংগ্যা একাধারে কবি, সাহিত্যিক, গীতিকার। তার রচিত 'গীতি পোই' তন্‌চংগ্যাদের প্রথম ও একমাত্র গানের পুস্তক। তিনি একজন দক্ষ জনপ্রিয় শিশু সংগঠকও বটে । তিনি দিব্যেন্দু, অনুপম ও দীপংকর নামে তিন পুত্রের জনক। শিল্পীর জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরা হলোঃ

* ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে একক প্রচেষ্টায় রাঙামাটি চারুকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন।

* ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ ইং চিত্রকলায় নিবেদিত প্রাণ ও অনন্য অবদানের জন্য চাক্‌মা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় কর্তৃক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

*১ জানুয়ারী, ১৯৮১ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক "সম্মাননা পদক" লাভ করেন।

* ১৯৮২ সালের বাংলাদেশ শিশু একাডেমী আয়োজিত জাতীয় শিশু কিশোর প্রতিযোগিতায় তাঁর একাডেমীর চারজন ছাত্র-ছাত্রীর দুটি জাতীয় স্বর্ণপদক ও দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ। পার্বত্য জনপদে চারুশিল্পের নতুন দিগন্তের সূচনা হয় তখন থেকেই।

* ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ সালে চারুকলা বিষয়ক পুস্তক "চিত্রা" প্রকাশিত হয়।

* তন্‌চংগ্যা জাতির সর্বপ্রথম ও একমাত্র গানের পুস্তক "গীত পোই" রচনা করেন তিনি।

* ২০০০ সালে তন্‌চংগ্যা সাহিত্যের গ্রন্থ "তন্‌চংগ্যা জাতি" প্রকাশিত হয়।

* এছাড়াও চাকমা, বাংলা গান রচনা ছাড়াও বহু বাংলা কবিতা এবং ছোট গল্প লিখেছেন ।

* সর্বশেষ ২০০৫ সালে বাংলাদেশ বেতারের গীতিকার হিসেবে স্বীকৃতি পান।

তৈন্-গাঙ

সজল তন্‌চংগ্যা

এলং আমি ব্যাগে মিলি তৈন্‌গাঙ কুয়ে মিলিমিশি
আচ্যা আগি কনে কনত, ন তুলি আমি কায়-অ মনত্।

ঘ-এল, ধন-এল, এল আ ভূই- জুমি
সিলগে আ এল আমা মনত্ গম-পাফি।
চু-ডাকাইতে লুলাক ব্যাগ আমা ধনানি কায়কুই,
তাঁ-লগে বাঙালানিয়ে লুলাক জাগানি দখলগুই।

যদি পাইত্ত্যং থে এক্কান জাগাত, এক্কানত গুই দলবানি,
নপাল্ল্যাক্তুন কিয়ে-ই ভাঙেদি আমা সেক্কেনেগা লাভা দিননানি
যুদ্ধ-দয়ে কিয়ে গিয়ন্দোই মিজোরামত পং ওই,
সি-পরে লাংগে-দয়ে আদাগিয়ে গেলাক আরাকানত্ গাত্তি-বক্সা লই।
বাঙালাদেশত জিওন থেলং নপাল্যং সিওনঅ-থে একানত্
পানি দ-গায় ঢে জেনান্ যে আগি আত্তে রাঙ্গামাছ্যা আ বান্দরবানত্॥

তৈন-গাঙ-অ করা আইচ্যা পুসাগুল্লো কইন পন কিয়েই গম গুইনান,
তন্‌চংগ্যা নাঙান বাসি আগে তৈনগাঙলই মিশিনান।
কিয়ে কন্তে তন্‌চংগ্যা নাঙান তৈনগাঙানত্তুন উয়েরে,
কিয়ে কন্তে মগ-নাঙে তং-করাত্তুন পিয়ন্দে
আমি বেলে শাক্যবংশত্তুন ব্যাগ তন্‌চংগ্যানি আচ্ছিরে,
সিয় পাগি পুত্তিবস বার্মা সরকারে সম্বর্ধনা দে-রে।

তন্‌চংগ্যা গুইনান মানচিয়ে করে যম-সম গমলাগে
শাক্য বংশত্তুন আচ্ছি-ই গুনিনে আ-বেক মনত জ্ঞান জাগে
যি-জাতিবাত বুদ্ধ-ধুক্ক্যা সর্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী জনম লন,
সি-জাতিবা কেনে সেরক পির্সে পুই থে পন!
আমি আত্তে সময়ান বরবাদ উবাত্ নদিবং
জ্ঞানী গুনী কেনে অয়া যায় সি চেষ্টাআন গুইযেবং
জ্ঞান ভান্ডারান বাইলে তে গম জাঙালান দিগিবং
সি-জাঙালেত্তি যেনান যে গম এক্কান জাগাত লুমিবং।
তৈনগাঙ-অ কুয়েগা জিংকানিয়ান ফি-আত্তে পেবাত্ নাই
ইতিহাসত্ ভুল-আনি ঠিক গয়ানা সাড়া উপায় নাই।
তন্‌চংগ্যা জারত্তুন বুউত মানুচ শেষ্ঠ উপাধি পে গিয়ন
আমিয় চেষ্ঠ গুইসেলে তা দুক্যা মানুচ ঐই পাইবং
আইস্য আতে আমা ব্যাগ গসানি এক্কান জাগাত থুবা অই থে,
এক্কয়া থমত্ ধুইনান দুই দর-মর গুই দাড়ে যে।

তৈন্ গাঙ

অছ্য কুমার তন্‌চংগ্যা সজিব

বহুকাল পূর্বে, প্রকৃতির কোন এক আপন খেয়ালে
বিস্তৃর্ণ সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে ধরিত্রীর বুকে,
জন্ম নেয় নীরব-শান্ত একটি নদী;
তৈন্‌গাঙ।

অত:পর থেমে থাকেনি কোনো একটি স্রোতধারা
প্রকৃতির ধর্ম মেনে বয়ে গিয়েছে আপন গতিতে,
কালের পরিক্রমায় লালন করেছে একটি জাতি;
তন্‌চংগ্যা।

যুদ্ধাহত সেই জাতি শেষ আশ্রয়ের খুঁজে
দ্বিগিদিক হন্যে: সুদূর আরাকান থেকে
যেন মায়ের কোলে আশ্রয় নিতে আসে,
নীরব-শান্ত নদী তৈন্‌গাঙ এর পাড়ে।

তারপর থেমে থাকেনি সেই জাতির দৃঢ় প্রত্যয়,
নতুন সভ্যতা গড়তে শুরু করে ....
একবুক আশা আর দূরন্ত সাহস সম্বল করে,
তৈন্ সভ্যতা বিস্তৃতি ঘটায় তৈন্‌গাঙ এর অববাহিকায়।

সেই কতো বছর পরে তৈন্ গাঙের সন্তানেরা!
আজ ছড়িয়ে আছে পার্বত্যর নানা প্রান্তে,
আর তৈন্ গাঙ আজও বয়ে চলে তার আপন গতিতে,
নীরবে, নিভৃতে।

নেই কোন সন্তানের প্রতিমায়ের অভিমান—
একটি নদীর পাড়ে বিস্তৃতি একটি সভ্যতা জাতি,
এ যেন এক অবিচ্ছেদ্য ইতিহাস;
তৈন্ গাঙ আর তন্‌চংগ্যা জাতির আত্মপ্রকাশ।

.......................ছাত্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমার সামাজিকতা

কিশোর তনুচংগ্যা

আর্তনাদ কখন সে গগণ বিদারী হয়েছে
টেরও পায়নি কেউ।
তবুও নির্লিপ্ত হাহাকার, বাঁচার প্রামান্য চেষ্টা।
সামাজিকতার আড়ালে এসিডে ঝলসে যাওয়া
অসামাজিকতার বিকৃত মুখ,
রাজনৈতিক নেতার হাতে—
বার বার ধর্ষিত হওয়া সমাজ,
নেতিয়ে পড়া এক চিলতে রোদ্দুর—
দূর মেঘের প্রান্তে গর্জন
যেন সন্ত্রাসীদের দুর্দান্ত প্রতাপ
আর আমার মায়ের চির দুখিনী
হাহাকার।
তবুও বাঁচার প্রাণান্ত চেষ্টা
একি সেই সামাজিকতা ?

ছাত্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিয়াত্রা হও তুমি

রোনাল্ড চাকমা

যুদ্ধরত বীর রুনু খাঁ
আবেগঘন জোছনালোকিত এক রাতে
চেয়েছিল বিয়াত্রার ভালোবাসায়
নিজেকে সিক্ত করতে।
বিয়াত্রার মনেও সাধ জেগেছিল
রুনু খাঁ'র সুপ্রশস্ত বুকে
নিজেকে সমপর্ণের।
কষ্টে বুক ফেটে যায়
ভালোবাসা বিসর্জনে–তবুও বিয়াত্রা
হিম শীতল কণ্ঠে বলে উঠেছিল–
যুদ্ধে যাও বীর, ফিরিঙ্গি তাড়াও
হাসি ফোটাও কার্পাস মহলে।
অস্তিত্ব সংকটের এই সময়ে
যুদ্ধে আমাকে যেতেই হবে---
তোমাকেও হতে হবে এ যুগের বিয়াত্রা
অভিমান নিয়ে নয়,
প্রতীক্ষায় থেকো মালায় আর মঙ্গল ঘটে
ফিরে আসব বিজয়ীর বেশে;
আনন্দে মুখর হবে
আমাদের প্রিয় কার্পাস মহল।

কবি ও সংগঠক

পড়ে থাকা

সুদীপ্তা তনচংগ্যা

সময়ের নিষ্ঠুরতায় বয়ে চলেছে বাস্তবতা
কেউ হাসছে, কেউ বা কাঁদছে,
প্রকৃতির ঘূর্ণিচাকায় ঘুরছে পৃথিবী
আমি আমি. . . . .!
আলো আধারের খেলায় পড়ে আছি,
দোদুল্যমান তীরের বেগে ছুটে চলা
এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে,
ক্লান্তিহীন গতিপথ—
এক এক করে মিলে গেছে ঘুমন্ত পৃথিবীতে।

সেই এক অদ্ভুত রঙ্গমঞ্চে—
চেনাসুর বড় আজ অচেনা লাগে,
তলায়িত স্রোতে পড়ে থাকা সুখ,
সীমাহীন দীর্ঘশ্বাসে আঘাত হানে
অজানা প্রশ্নের ভীড় জমে
নীড়ে ফেরা পাখিদের গৌধূলালয়ে।

কিন্তু........!
নিজেরই কষ্টের মৌনতা,
খুঁজে ফেরে নিঃশব্দতায়।
প্রকাশ্যে নয়—
অপ্রকাশ্যে ঢাকা পড়ে মনের আঙ্গিনায়॥

ছাত্রী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

রোমন্থন

সুমনা মানকিন

নিশুতি জ্যোৎস্নালোকিত অষ্টাদশী নিশাকান্ত—
চতুস্পার্শে সুশোভিত মহীরূহ; হাসনুহেনার
স্নিগ্ধতায় মাতাল আলো আঁধারি; ঊর্ধালোকে
নক্ষত্ররাজির লুকোচুরি; অপলক জেগে থাকা
চাঁদ-তেমনি এক বাটিকায় তোমার আশ্লেষে
সিক্ত হয়েছিল চিত্ত-চিরায়ত ভূষে নিবিড় সান্নিধ্যে
প্রেমের আমার বরষায় ধুয়ে-ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ প্রলয়
দেখেছিল সে রাত; মহাকালও মনে হয় বিনাশ
হয়েছিল; তবুও প্রভাত হয়েছিল ঠিক, ভানুও
হেসেছিল, তুমি আমিও রয়ে গেছি।

ছাত্রী
ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

আদিবাসী-নি জুগুরি

তন্‌চংগ্যা টি, এফ টার্জানিন

ম-মনান ইছ উবি উরে, দ গ-এ
ছি লক্কে করানি মনত্ উরিলে।
যিলক্কে মালছড়িত্ আমা আদিবাসীনি ঘঅ
পুই ফেলে দেরন, ক্যঙ বুদ্ধমূর্ত্তি ভাঙে দেরন।
যিলক্কে মধুপুরত ইকোপার্ক বানে বাত্ নাঙে
আমা আদিবাসীনি-এ মাই ফেলারন,
তা জাগা-ভুই কাইনান্ লরন্।

ম-মনান ইছ উবি উরে, দ গ-এ
যিলক্কে রামগড়, দীঘিনালা, নান্ন্যাচর
আ বুউত্ জাগাত্ আদিবাসীনি ঘঅ ভিরাত,
সেটেলার আনিনান্ ভয়ে দেরন,
আদিবাসীনি এ কাবিনায়, পুইফেলে ম এ ফেলারন্
চিরি মানুইত্চানি কেনে বাচি থেবাক্!
তা-রঅ ইছ দোয়ে দোয়ে জীবন কারারন্।

তা দ্যুত উইয়ে রে তা আদিবাসী,
আদিবাসীনি মানুইত্ নয়।
ইক্যা দোয়ে দোয়ে ধেনান্ কয়দিন তা বাচি থেবাক্?
কমলে তা নি-জ জাগা ফি পেবাক্?
কমলে গম্ গুইনান্ জীবনান্ কারেবাক্?
তা কিছু মাইত্ ন-পান, ত-অ তা আশা গুইথান,
একদিন তা সু-গ দিন এব বিলিনান্।

আদিবাসী যুবক

সুপর্ণা তনচংগ্যা

হে আদিবাসী যুবক,
তারুণ্যের তেজদীপ্ত যৌবনে
প্রাণের স্পন্দন জাগ্রত করে
উজ্জীবিত হও সৃষ্টির প্রয়াসে।

হে আদিবাসী যুবক,
অনাগত উজ্জল সোনালী ভুবনের সন্ধানে,
সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা পেরিয়ে
জেগে ওঠো অন্ধকার শৃঙ্খল ভেঙ্গে।

হে আদিবাসী যুবক,
আলোকিত কর স্বীয় জাতিসত্তাকে
লালিত কর আপন সংস্কৃতিকে
কীর্তি রবে তোমার তবেই চিরকাল।

হে আদিবাসী যুবক,
পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়,
মুক্ত বিহঙ্গের ডানা মেলে
অবতীর্ণ হও বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।

হে আদিবাসী যুবক,
উত্তাল সমূদ্রের মাঝ পথে
সীমাহীন অন্ধকার জীবনযুদ্ধে
ভুলেও রেখো না পিছুটান।

হে আদিবাসী যুবক,
আর্তমানবতার সেবায় ব্রতী হয়ে,
কুসংস্কারমুক্ত, সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে
সৃষ্টি কর নতুন এক বিশ্ব।

হে আদিবাসী যুবক,
সৃষ্টি কর...
বিশৃঙ্খলার পরশবিহীন শান্তি
বন্ধুত্বপূর্ণ, মৈত্রীময় ও হানাহানিমুক্ত এক নব দিগন্ত।

ছাত্রী
রাংগামাটি সরকারী কলেজ।

শিরোনামহীন কবিতা

রামবাদু ত্রিপুরা (স্টিভ)

আমাদের ক'জনের মুখ ছিল আর
ওদের ছিল হাত,
লম্বা হাতে তারা যাচ্ছেতাই করতো।
আমরা মুখ খুলতে গেলে করা হতো কণ্ঠরোধ,
মুখটা তখন নিরুপায় কিন্তু তখনও আমাদের
চোখ ছিল;
চোখের সামনে লাঞ্ছিত করা হতো,
করা হতো রক্তের হোলি খেলা,
ওরা রগচটাতো আমাদের ওপর
আমরা দেখে ফেলেছি কেন!

আমাদের ক'জনের মগজ ছিল আর
ওদের ছিল মাথা
মাথার ভারে পাশবিকতার দারুণ দাপট,
আমরা তাই ফিরে চললাম মগজের মানবিকতা নিয়ে।
আমরা ক'জন শান্তি চেয়েছিলাম,
কিন্তু বয়তে হলো শান্তিভঙ্গের দায়,
স্বপ্নও দেখেছিলাম, তাই
স্বপ্নভঙ্গের হাতকড়া আসামী আজ।

৭১-এর কাছে আমরা বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম,
৭১-এর কাছে চেয়েছিলাম শোষকের বেড়াজাল মুক্তি,
কিন্তু কি পেলাম!
আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম?
যেখানে রক্তের হিসাব প্রতিদিন দিয়ে যেতে হয়
মুক্ত চিন্তা ও কণ্ঠে অবরোধ করা হয়!
আজ অবরুদ্ধ আমরা ক'জন
আমাদের মগজ অত্যাচারিত,
ওরা বুঝাচ্ছে মাথার কার্যকারিতা
দেখাচ্ছে শৃঙ্খলার নব্য নীতিমালা;
আমাদের ক'জনের কারারুদ্ধ আক্ষেপ
আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম?

---

*ছাত্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

নিজস্ব রিপোর্টার

পুচনু মারমা

সবুজ অরণ্যের স্নিগ্ধতায় আবৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম।
গিরিতল বেয়ে গেছে সাঙ্গু, চেঙ্গী, মাতামুহুরী, মাইনী নদী ;
দূর পাহাড়ের বুকে ধুসরকুয়াশার আলপনা,
বিস্তৃত অরণ্যের সাথে নীলিমার আলিঙ্গন,
সবুজ পাহাড়ের দিগন্তের সাথে খন্ড খন্ড মেঘের মিতালি ;
বনে বনে হরিণ ঘুরে বেড়ায়,
গহিন জঙ্গলে দেখা যায় হাতির পাল,
ইদানিং সর্বত্র দেখা যায় সেটেলার বাঙ্গালি।
জুমের মাচাঙঘর থেকে মাঝে মধ্যে
শুনা যায় তে:দৌ(পাখি)-এর ডাক,
সর্বত্র শুনা যায় সেনাবাহিনীর টহলের পদধ্বনি ;
গভীর জঙ্গলে কখনো কখনো
মুখোমুখি হয় হিংস্র বাঘ-ভাল্লুকের,
এ সব জন্তুর চেয়েও হিংস্র সেনাবাহিনীর থাবা ;
প্রতিদিন হানা হচ্ছে জুম্মজাতির মানবতা আর অস্তিত্বে
যাদের গগণ বিদারী আর্তচিৎকার
পৌঁছায় না বিস্তৃত অরণ্যের গভীরতা ভেদ করে লোকালয়ে ;
আটকে থেকে যায় পাহাড় থেকে পাহাড়ে,
অরণ্য থেকে অরণ্যের গভীরতায়;
ঐ অরণ্যের গভীরতা ভেদ করে
মানবতার আর্তচিৎকার লোকালয়ে পৌঁছে দিতে—
চাই নিজস্ব রির্পোটার।

ছাত্র
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বৃহত্তর পার্বত্য অঞ্চল রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সমূহের একমাত্র উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড" আপনাদের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করেঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১। উদ্যান উন্নয়ন, রাবার বাগান গড়ন ও বন সৃষ্টিসহ দরিদ্র, পশ্চাদপদ, ভূমিহীন ও ভ্রাম্যমান পরিবারগুলিকে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন করতঃ আর্থসামাজিক অবস্থান সাধন করা।

২। স্লুইস গেইট নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, দমকল, ট্রাক্টর, মৎস খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, মাছ ধরার জাল ও নৌকা সরবরাহ, পানি নিষ্কাশন ও সেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান করা।

৩। রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, সিঁড়ি, যাত্রী-ছাউনী নির্মাণ ও সংস্কারের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যস্থার উন্নতি সাধন করা।

৪। পল্লী স্বাস্থ, সমাজ কল্যানমূলক প্রতিষ্ঠান ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সংস্কার, ছাত্রাবাস নির্মাণ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিশ্ববিদ্যালয়সহ) অর্ধয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা সম্প্রসারনের ব্যবস্থা করা।

৬। পার্বত্যাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় ক্রীড়ারমান উন্নয়নের লক্ষ্যে খেলার মাঠ উন্নয়ন ক্লাব, ব্যায়ামাগার ও ষ্টেডিয়াম নির্মাণ করা ও খেলার সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা।

৭। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংস্কার করণ।

৮। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগণের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।

৯। আধুনিক হাসপাতাল ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে জনসাধারণের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ও জনসংখ্যা রোধ করা।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনসাধারণের উন্নয়নের উদ্দেশ্য সমবায়, মৌল স্বাস্থ্য রক্ষা, পুষ্টি, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন গৃহস্থলী পেশার উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পারিবারিক বিকল্প আয়ের সংস্থান করা।

১১। পাহাড়ে ঢালু জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে উৎসাহিত করণ পূর্বক ভূমি ক্ষয়রোধ ও উর্বরতা সমুন্নত রাখা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা।

১২। পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব সৃষ্টি করা।

১৩। ভৌগলিক তথ্য পদ্ধতি এর মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের বহুমুখী তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিনিময়ের মাধ্যমে এলাকা ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

১৪। পার্বত্য অঞ্চলের দুঃস্থ ও দরিদ্র জনসাধারণের আম, লিচু, কমলা, কফি ও বিভিন্ন ফলের বাগান সৃস্টিসহ শাক-সবজীর বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা।

১৫। নিঃস্ব ও গৃহহীণ পরিবার সমূহকে যতদূর সম্ভব গৃহায়নের ব্যবস্থা করে দিয়ে পুর্নবাসন করা।

১৬। সরকারী-বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সহিত সমম্বয় সাধন।

১৭। অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
রাঙ্গামাটি।

তৈন্-গাঙ প্রকাশনা পর্ষদ কর্তৃক সংকলন প্রকাশনা "তৈন্-গাঙ" কে স্বাগত জানাই।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ নিজস্ব উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস্য, পশুসম্পদ, সংস্কৃতি, কুটির শিল্প, সমাজ সেবা, জনস্বাস্থ্য, সমবায়সহ ১৫টি হস্তান্তরিত বিভাগের মাধ্যমে পার্বত্য জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছে। এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বস্তরের জনগণের কাছে থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি।

ড. মানিক লাল দেওয়ান
চেয়ারম্যান
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ,
রাঙ্গামাটি।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে

তৈন্-গাঙ

প্রকাশনাকে স্বাগত জানাই

মণিস্বপন দেওয়ান

উপমন্ত্রী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার